সতী-লক্ষ্মী।

(উপন্যাস।)

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত।

মূল্য ১. টাকা।

প্রকাশক—শ্রীশরৎকুমার হোড়,
শ্রীগোবিন্দ সাহিত্য মন্দির।
২৩।১, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

"তৃতীয়বারে"

নূতন সংস্করণ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

প্রিণ্টার—শ্রীশরৎকুমার হোড়
শ্রীগোবিন্দ প্রেস,
২৩।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

—:০:—

বর্ত্তমান যুগের বিক্রমাদিত্য

কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ভূপ বাহাদুরের শ্রীকরকমলে তাঁহার একনিষ্ঠ বাণী সেবার গৌরব-স্মৃতি রক্ষাকল্পে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

১৩১৩ সাল
২রা ফাল্গুন।

বিনীত—
শ্রীবিধুভূষণ বসু
বিষ্ণুপুর, চিরুলিয়া, খুলনা।

সতী-লক্ষ্মী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে; স্বামীর আফিস্ হইতে আসিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া, কমলা উৎসুক নেত্রে বার বার পথের দিকে চাহিতে-ছেন। হস্তপদ প্রক্ষালনের জল এক পাত্রে, মুখ প্রক্ষালনের সুবাসিত শীতল জল অন্য পাত্রে রাখিয়া, কমলা ষ্টোভের উপর চাএর জল গরম করিতেছেন। পার্শ্বে জলখাবার প্রস্তুত; হাতের কাছে পাখা। পাখা-খানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবু দুই তিনবার কমলা তাহা ঝাড়িয়া, মুছিয়া রাখিলেন। একবার একটু বাতাস করিলেন, যেন পাখার বাতাস তৃপ্তিপ্রদ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। পালঙ্কের উপর সুপরিচ্ছন্ন শয্যা বেশ করিয়া ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিলেন। আঁচল দিয়া চেয়ারখানি মুছিলেন, টেবলটী ঝাড়িলেন, বই, কাগজ, কলমদানী ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিলেন। ক্রমে ছয়টা বাজিল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল; তবু যাঁহার জন্য কমলা গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না, তিনি আসিলেন না। কমলা বড় উদ্বিগ্না হইলেন, আফিস হইতে আসিতে এরূপ বিলম্ব মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, চিন্তার কোনও কারণ

নাই; কিন্তু এরূপ হইলে কমলার মনে বড় ভাল লাগে না; কেমন একটা উদ্বেগ আসিয়া পড়ে। অন্য কাজে মনোনিবেশ করা যায় না। কি করা যায়? কমলা স্বামীর গড়গড়ার জল ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন, তবু আবার ফিরাইলেন, নলটীতে ফুঁ দিয়া অনর্থক তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলেন। আঁচলের বাতাস দিয়া দেওয়ালের ছবিগুলি ঝাড়িতে লাগিলেন।

বালিকা ফুলরাণী বাবার পা টিপিবে, মাথা আঁচড়াইবে, পিঠে হাত বুলাইবে, আর তাঁহার কাছে ভাল ভাল গল্প শুনিবে ভাবিয়া অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। বাবা আসিলেন না দেখিয়া বালিকার ধৈর্য্য-চ্যুতি হইল, ছুটিয়া খেলিতে গেল। কমলার বড় দায় হইল, এদিকে গৃহকর্ম্মের সময় যায়। ঝি আসিয়া বলিল, "উননে কয়লা ধরাইব?" একটু বাদে ধরাইও" বলিয়া কমলা তাহাকে বিদায় করিলেন। কিন্তু আর এরূপে বসিয়া থাকা যায় না। রান্নার আয়োজন করিতে হইবে, খোকাকে দুধ খাওয়াতে হইবে; নরেন্দ্রনাথের ক্ষুধা পাইয়াছে, সকালে সকালে তাহাকে ভাত দিতে হইবে, শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আহ্নিক করার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কমলার বড় রাগ হইল। ভাবিলেন আজ আসিলে ঝগড়া করিব। বোধ হয় অনর্থক কোথাও বিলম্ব করিতেছেন, হয়ত কোনও বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া গল্প করিতেছেন। তা, বেড়াতে যদি যেতে হয়, বাড়ী এসে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে গেলে কি হয় না? অন্ততঃ বাড়ীতে একবার বলে গেলে দোষ কি? এই যে আমি একটা লোক ব'সে ব'সে হয়রাণ হচ্ছি, এটা কি অন্যায়! যা'ক আস্তে হয় আসুন, না হয় না আসুন; আমি আর ব'সে ব'সে পারি না। যাই কাজ কর্ম্ম দেখি গিয়ে।

কমলা সংসারের কাজ কর্ম্মে হাত দিলেন বটে, কিন্তু মন দিতে পারিলেন না। স্বামীর গৃহে ফিরিবার বিলম্ব তাহার মোটেই ভাল

লাগিতেছে না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, অনেক আফিসের বাবু তাঁহাদিগের বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন, এ অফিসার বাবুর কি এখনও আসিবার সময় হয় নাই? মহানগরীর রাজপথের দীপাবলী একে একে জ্বলিয়া উঠিল, রাত্রি সমাগত, এখনও তিনি আসিলেন না। এই ত চৈত্র মাস দারুণ গ্রীষ্ম, এখনও তিনি সেই অফিসের পোষাক পরিয়া কেমন করিয়া রহিয়াছেন? তিনিত প্রত্যহ পাচটার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িয়া চা পান করিয়া, কিছু জলযোগ করিয়া কোন দিন পড়িতে বসেন বা কোনও দিন বেড়াইতে যান। ইহার ব্যতিক্রম ত কখনও ঘটে না। আজিকার এ বিলম্ব কমলার পক্ষে বড়ই অসহনীয় বোধ হইল। কমলার এই ত্রিশ বৎসর বয়স, তিনটী পুত্র কন্যার জননী তিনি, কিন্তু স্বামীর সেবাতে, স্বামীর সঙ্গলাভে তিনি নিতান্ত বালিকা বধূটীর মতন অতৃপ্ত অনুরাগিণী। কমলা তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাছে মনের এ চাঞ্চল্য ব্যক্ত না করিয়া পারিলেন না। বলিলেন "আজ কি মা অন্যত্র কোথাও যাওয়ায় কথা ছিল?" মা বলিলেন, "না তেমন ত কিছু বলে যায় নাই দেবেন। আজ এত দেরী কচ্ছে কেন কি জানি?"

"মানুষটার ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ একবারেই নাই। আজ যাবার বেলায়, ভাল ক'রে খেয়েও যান নাই। খেতে বসতে একটু দেরী হয়েছিল। এ দিকে ঘড়িতে দশটা বেজে গেল; পোড়া অফিসের কাজে পাঁচটী মিনিটও নড়ে যাবার যো নাই। এমন করে চাকরী করে মানুষ কত দিন বাঁচে?" বলিয়া কমলা চায়ের কেটলিটা ষ্টোভের উপর হইতে নামাইতে হাত হইতে তাহা সরিয়া পড়িয়া গেল। তখন নরেন খেলিয়া বেড়াইয়া গৃহে ফিরিল। নরেনের ঠাকুরমা বলিলেন, হারে নরেন, তোর বাবা আজ এত দেরী

কচ্ছে কেনরে ? নরেন বলিল, হয়ত আফিসে কোনও জরুরি কাজ পড়ে গেছে। কমলা বলিলেন, তাই বলে সেই সকালে দশটায় গিয়েছেন, আর এই সাড়ে সাতটা বেজে যায় এর মধ্যে ছুটি নাই। নরেন বলিল তা কি করবে মা ? চাকরী করে খেতে গেলে আপনার আরাম বিরাম দেখা ত চলে না, মুনিবের কাজ আগে আরাম বিরাম তার পরে।

ঠিক সেই সময়ে বাহিরের দ্বারে কড়া নড়িল। নরেন দ্বার খুলিয়া দিল, আরও দুইটী বাবুকে সঙ্গে লইয়া দেবেন বাবু বৈঠক খানার ঘরে প্রবেশ করিলেন। উপরের তলায়ই বৈঠক খানা ঘর, তাহার পার্শ্বেই শয়ন কক্ষ। সে কক্ষে থাকিয়া ইচ্ছা করিলে বৈঠক খানার ঘরের কথা বার্ত্তা শোনা যায়। দুই ঘরের মধ্যে দরজায় একটী পর্দ্দা লটকান মাত্র।

তিন জনই সেই গলদঘর্ম্মদেহে মলিন বিষন্ন শুষ্ক মুখে, অফিসের পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় বৈঠক খানার ঘরে তিন জনে তিন খানি আসনে বসিয়া পড়িলেন। দেবেন বাবু নরেনকে ডাকিয়া দু'খানা পাখা দিতে বলিলেন। নরেন দু'খানা পাখা লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। একটী বাবু পাখা হাতে হাওয়া করিতে করিতে বলিলেন, "কি করা যায় বলুন, সাহেবটার বেয়াদবীত আর বরদাস্ত হয় না। কত বড় অপমান কত বড় লাঞ্ছনা বলুন দেখি।"

দেবেন্দ্র নাথ অতি ম্লান মুখে নিস্তেজ কণ্ঠে বলিলেন, "এইত অধীন চাকুরে জীবনের দুর্গতি। উপায় কি ? আমরা যে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর পাতিয়ে বসেছি। এই দাসবৃত্তি ছাড়া ত স্ত্রী পুত্রের ভাত কাপড় যোগাবার অন্য পথ নাই। অন্নহীন বাঙ্গালী, মনুষ্যত্বের দাবি করবার তার কি অধিকার আছে ?"

দ্বিতীয় বাবুটী বলিলেন, "তাই বলে কুকুরের মতন চাবুক খেয়েও চাকরী বজায় রাখতে হবে?"

দেবেন বাবু বলিলেন, "কি করবে ভাই? এই চাকরী আছে, তাই ছেলে পিলের মুখে দুটী ভাত দিতে পাচ্ছ, না থাক্‌লে কি উপায় হতো। এই চাকরীর জন্যই সহস্র সহস্র যুবক ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হচ্ছে।"

প্রথম বাবু বলিলেন, "তা'ও দেখ্‌ছি, কিন্তু মানুষ হয়ে এমন হেয় পশুর মতন বোবা হ'য়ে মার খাওয়া আর চলে না। আমি বলি, আসুন আমরা এক সঙ্গে চাকরী ছেড়ে দেই। দেখা যাক, ফিরিঙ্গিরা কিরূপে আফিসের কাজ গোছাল করে রাখ্‌তে পারে?"

দেবেন্দ্র নাথ হাসিয়া বলিলেন, "কথাটা যুক্তিতে যেমন অতি সত্য, কার্য্যতঃ তেমনি অতি অসম্ভব। বাঙ্গালী কেরাণির দল যদি এক যোগে কলম ছাড়্‌তে পারত, তবে এই কলম পেশার দর অনেক বেড়ে যেত সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী তা পারবে না, যা'ক ওসব আকাশ কুসুম কল্পনা ছেড়ে দাও। চাবুক খেয়েছি আমি, আমার তাতে দুঃখ নাই। সহযোগী ভাইদের সুখ সুবিধার জন্য চেষ্টা কর্ত্তে গিয়েছি তাতে চাবুক খেয়েছি, যদি কৃতকার্য্য হতে পার্ত্তাম তা হলে আর বিশটা চাবুকের ঘায়ে পিঠের রক্ত মাটীতে পড়্‌লেও আমি দুঃখিত হতাম না। আজ সকলে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর, তার পর ভেবে চিন্তে দেখা যাবে।

আরও দুই চারিটী কথা বার্ত্তা বলিয়া বাবু দুইটী উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র নাথ তখন বৈঠক খানা হইতে উঠিয়া ভিতরে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলেন। অন্য দিন দেবেন্দ্র বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়াই পুত্র কন্যাদিগকে ডাকিয়া আদর করিতেন, প্রায় প্রত্যহই কিছু

কিছু খাবার আনিয়া পুত্র কন্যাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। আজ কিন্তু সেরূপ কিছুই করিলেন না; আফিসের পোষাক ছাড়িয়া বিষন্ন গম্ভীর মুখে শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। কমলা স্বামীর পদবিক্ষেপ মাত্র দেখিলে, তাঁহার মনের স্বস্তি অস্বস্তির মাত্রা বুঝিতে পারিতেন। আজ তিনি বুঝিলেন, স্বামীর মনে নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর ব্যথায় আঘাত লাগিয়াছে। বুঝিতে পারিয়া কমলা এ সময়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার শ্রান্ত ক্লিষ্ট মন আরও বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। আগে তাহার আহারাদির ব্যবস্থায় মনোযোগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•ঃ*ঃ•—

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, আজ চা খাইব না চায়ের প্রয়োজন নাই। পরিচারিকাকে তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন। দেবেনবাবু পল্লীবাস কালে যৌবনের পূর্ব্বেই ধূমপান করিতে শিখিয়াছিলেন, সহরে আসিয়া চা পান করিতেও শিখিয়াছেন, কিন্তু ধূমপানের অনাদর করিতেন না। বরং সিগার, সিগারেট, গড়গড়া হুকা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে তাম্রকূট ধূমের সম্ভ্রম আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখ করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, তখন কমলা একখানি থালায় খান কয়েক গরম লুচি ও কিছু হালুয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "আজ ভাত হ'তে একটু দেরী হবে, এই লুচি ক'খানা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। তোমার আস্‌তে দেরী দেখে আমি রান্না কর্ত্তেও দেরী করে ফেলেছি।"

দেবেন্দ্রনাথ তেমনি গম্ভীর মুখেই বলিলেন "তা হোক, আজ মোটে ক্ষুধাই নাই, লুচি মণ্ডার কি দরকার?"

কমলা বলিলেন, "আজ ত দুপুরেও তোমার ভালরূপ খাওয়া হয় নাই। তুমি ত বাজারের খাবার খাও না, তবে ক্ষুধা গেল কোথায়?"

দেবেন্দ্র একটু মৃদু হাসিয়াই বলিলেন- "আজ যা খেয়েছি কমলা, তাতে সাত দিন মধ্যেও যে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা আসে বলে মনে হয় না।"

কমলা স্বামীর বিষণ্ণ মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়াই বলিলেন, "শুন্‌লাম আফিসের সাহেবের সঙ্গে মারামারি করে এসেছ। পরে সব শুনবো, আগে খেয়ে নাও। তুমি কিছু খেয়ে সুস্থ না হলে, আমি রান্না ঘরে মন খাটি করে বস্‌তে পারবো না, তা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?"

দেবেন্দ্রনাথ খাইতে বসিলেন, কন্যা ফুলমণি পুত্র সুরেনকে ডাকিয়া পাতে বসাইলেন। স্বামীর জলযোগ শেষ হইলে কমলা তাঁহাকে পান ও তামাক সাজিয়া দিয়া রান্না করিতে গেলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেনের বয়স এই ষোল বৎসর, এবার সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে। পাশের খবর এখনও বাহির হয় নাই। নরেন পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধীরে বলিল "বাবা! আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে চমৎকৃত হ'লাম। সাহেব উপরওয়ালা, তাই ব'লে ভদ্রলোকের গায়ে চাবুক মার্ল্লে? আর আপনারা তাই নীরবে সয়ে যাচ্ছেন?"

দেবেন্দ্রবাবু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন "এতে চমৎকৃত হচ্ছ বাবা! এ ত চমৎকারের কিছু নয়। ভাত কাপড়ের কাঙ্গাল পরাধীন বাঙ্গালী জাতির আবার ভদ্রতা সভ্যতার দাবি কোথায়? সাহেব কোম্পানী টাকার বলে বুদ্ধি কৌশলে বাণিজ্য বিস্তার করেছে, রেল করেছে। টেলিগ্রাফ্‌ করেছে, বহুবিধ কলকারখানা করেছে, তাই ত বাঙ্গালী গোলামি করে পয়সা রোজগার করে অন্নবস্ত্র যোগাড় কচ্ছে। সাহেবেরা আমোদ স্ফূর্ত্তি করবার জন্য ক্লাব করে, তাতেও দেশীয়েরা চাকর খানসামা মুহুরি সরকার রাখে, তারই প্রসাদে অন্নহীন অন্নলাভ ক'রে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। যারা ধনবলে, বিদ্যা বলে এত বড়, তারা আমাদের মতন হীন অকর্ম্মণ্য দাস জাতির সম্ভ্রম রাখ্‌বে কেন?"

নরেন একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এরূপ চাকরীর অন্নের চেয়ে উপবাস করা ভাল নয়?"

দেবেন্দ্র। ভাল বটে, চিরকাল দাসত্বের পেষণে তিল তিল করে জীবন খোয়ানর চেয়ে একদিনে মরণ বরণ করাও ভাল। কথার এমন বীরত্ব মনুষ্যত্ব প্রকাশ করা সহজ বাবা; কিন্তু যা ভাল, কার্য্যতঃ তা ক'জন কর্ত্তে পেরে থাকে? যা ভাল, তাই যদি ভারতবাসীর করবার শক্তি থাক্‌তো, তা হ'লে এই ত্রিশকোটি মানুষ দু'মুঠো অন্নের জন্য বিদেশীর পায়ে আত্ম বিক্রীত হ'তো না।

পিতা পুত্রে কথা হইল অনেক, মীমাংসা কিছুই হইল না। বালিকা ফুলীর বয়স দশ বৎসর, সেও কথাগুলি শুনিয়াছিল, সে বলিল, "সেবার যে আমরা দেশে গিয়াছিলাম, গ্রামে ত অনেক লোক দেখ্‌লাম, চাকরী করে না, তারাও ত খেয়ে পরে বেঁচে আছে।"

দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তাদের মধ্যে কেউ মাঠে পড়ে চাষ আবাদ করে, কেউ বাগানে মাটী খুড়ে ক্ষেত খামার করে, কেউ ছুতারের কাজ করে, কেউ কামারের কাজ করে; আমরা যে ভদ্রলোক মাঠের রোদ সইতে পারি না, গায়ে ধূলা কাদা লাগ্‌লে অসুখ করে, তায় আবার এ সব কাজে গেলে অপমান হয়।"

যথা সময়ে রান্না সারিয়া যায়গা করিয়া কমলা সকলকে আহারার্থে ডাকিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যেন অন্য মনস্ক ভাবে নিতান্ত অতৃপ্তির সঙ্গে আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে এমন একটা জ্বালার বিষ বহিতেছে, যাহার তীব্রতায় তাঁহার আজ সকল বিষয়েই অরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে। সকলের আহার শেষ হইলে, কমলা অতি শীঘ্র রান্নাঘর গোছাইয়া স্বামীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন "এ কি? তুমি খেলে না?"

কমলা বলিলেন, "খাবো পরে, আগে তোমাদের আফিসের আজকার ব্যাপারটা শুনবো। বিষয়টা আমাকে খুলে বল্‌তে হবে।"

কমলার প্রবল আগ্রহ বুঝিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিষয়টা খুলিয়া বলিলেন। তিনি যে আফিসের বড় বাবু, সেই আফিসে কয়েকজন ফিরিঙ্গি ও কয়েকজন বাঙ্গালীও চাকরী করে। ফিরিঙ্গিরা চারিটা বাজিলেই চলিয়া যায়, বাঙ্গালী কেরাণীদিগকে ছ'টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়। এই কথা লইয়া একজন ফিরিঙ্গির সঙ্গে বাঙ্গালীদের বচসা হয়। তাহার ফলে সেই দুর্বৃত্ত ফিরিঙ্গি ক্রোধান্ধ হইয়া একজন বাঙ্গালী বাবুকে জুতা পরা পায়ে লাথি মারে। বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের সকলের উপরে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ ফিরিঙ্গির এই ধৃষ্টতার কথা বড় সাহেবকে গিয়া ভদ্র ভাবে জানাইলেন। সাহেব শুনিয়া অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, ইহার আর কি করা যাইবে। দেবেন্দ্রনাথ সুবিচার চাহিলেন। দেশী ও ফিরিঙ্গিদিগের কার্য্যকালের এরূপ বৈষম্য অন্যায় বলিয়া, সকলের প্রতিই সমান সময় নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সাহেব সদম্ভেই বলিলেন, তিনি দেশীয় লোকের সঙ্গে সাহেব লোককে কিছুতেই সমান অধিকার দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ আফিসের বড় বাবু, তাহার বিশ্বাস সাহেব অবশ্য তাঁহার কিছু খাতির রাখিবেন। সেই বিশ্বাসে তিনি সাহেবের সঙ্গে যুক্তি দেখাইয়া তর্ক করিতেছিলেন। সাহেব যখন তর্কে হারিয়া গেলেন, তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ছড়ি দিয়া এক বাড়ি মারিয়া, এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, সাহেবদের সঙ্গে বাঙ্গালীর অতটা সমান আটাআটি কাড়াকাড়ি চলিতেই পারে না। এরূপ দাবি করাই দাস জাতির বেয়াদবি।

কমলা বসিয়া বসিয়া কথাগুলি শুনিলেন, সহসা কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার লাবণ্যময় গৌরকান্ত মুখ মণ্ডলে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল। ললাটের স্বেদ বিন্দু ঝরিয়া গণ্ড বাহিয়া ধারা বহিল। কমলা স্বামীর চিন্তা-বিমর্ষ মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া

নিশ্চল বৎসয়াই রহিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, "কি ভাবছ কমলা?"

কমলা বলিলেন, "এ চাকরী ছেড়ে দাও।" দেবেন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত ব্যথিত কণ্ঠেই বলিলেন, "মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম রাখ্‌তে হ'লে চাকরী ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তা বুঝি। কিন্তু মানুষ বলে গৌরব করবার কি কি আছে বাঙ্গালীর? দাসত্ব ভিন্ন যে আমাদের অন্ন বস্ত্রের অন্য উপায় নাই। এই ঘৃণিত দাস জীবনে আমরা আবার স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস করি। আজ দম্ভ করে চাকরী ত্যাগ কর্ল্লে, কাল স্ত্রী পুত্র উপবাস কর্‌বে। এ চিন্তাত ত্যাগ কর্ত্তে পারি না। বৃদ্ধা মা আমার, তাঁর এক বেলা দুটী হবিষ্যান্ন; তাওত এই চাকরীর উপর নির্ভর করে।"

কমলা নিরুত্তরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতি-পালন জন্য পুরুষদিগকে এত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়? এ অপমান, লাঞ্ছনা পুরুষের কেবল পরিবার পালন জন্য? নারীত একথা কখনও চিন্তা করে না। কমলা দেখিতেন, তাঁহার স্বামী প্রত্যহ স্যুট্ পরিয়া সাহেব সাজিয়া আফিসে যান, তাঁর স্বামী আফিসের বড় বাবু, সকলের উপরে, তাঁহার মতন শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? সেই গৌরবে কোমলা কত গরবিনী! প্রতি মাসে স্বামী দেড়শত টাকা আনিয়া হাসি মুখে কমলার হাতে দেন, কমলা তাহা স্বেচ্ছামত স্বাধীন ভাবে সংসারের খরচ করেন। তিনি দোতালা ঘরে বাস করেন, স্বামীর সোহাগে দেওয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া মনে মনে কত গৌরবই অনুভব করেন। তিনি কত দিন গাড়ি জুড়ি চড়িয়া সহরের উৎসব আমোদ, থিয়েটার সার্কাস দেখিতে যান। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাকিলে তিনি নিজেই নিঃসঙ্কোচে স্বাধীন ভাবে অপ্রয়োজনেও কত সাবান

আতর কিনিয়া বাক্স সাজাইয়া রাখিয়াছেন। একটী নূতন রকমের জামা কাপড় দেখিলে তখনই তিনি পুত্র কন্যার জন্য ক্রয় করেন। কমলা ভাবিতেন, তিনি যে রাজরাণীর মত ভাগ্যবতী! কিন্তু আজ তাঁহার সে আকাশ কুসুম কল্পনার অহঙ্কার যেন পলকে চূর্ণ হইয়া গেল! আজ যেন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার গৃহের অন্তরালে ঐ বস্তির ভগ্ন কুটীরে মলিন ছিন্ন বেশ কুলীরমণী অপেক্ষাও তিনি হতমান। তাঁহার এ সাজ সজ্জা, এ মণ্ডা মিঠাই সুখাদ্য অন্ন ব্যঞ্জন, ইহাতে যে কি নরকের অপবিত্রতা মিশ্রিত! দেবতার গৌরব দিয়া কমলা যে স্বামীর পূজা করিয়া আসিতেছেন, সেই স্বামী এত ছোট, পরের কাছে অন্ন বস্ত্রের দায়ে এত হতমান? তাহার সোনার ঠাকুরের গায়ে আজ যেন তিনি রাংতার প্রলেপ দেখিতে পাইলেন। স্বামীকে,—দেবতাকে এমনি ইতরের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে দিয়া নারী সম্পদের, সুখের, বিলাসের গর্ব্ব করে! ধিক এমন বিলাস বাসনায়! কমলার বাল্যকালে পঠিত পুস্তকের একটী আখ্যান সহসা মনে পড়িল। বুনো রামনাথ বলিয়া এক পণ্ডিত ছিলেন,—তিনি দেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। দেশের রাজা তাঁহার পদ-ধূলি লইয়া ধন্য হইতেন, কিন্তু তিনি তেতুলের পাতার ঝোল খাইয়া পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাহার ব্রাহ্মণীর হাতে এয়োতি রক্ষার চিহ্ন ছিল এক গাছি লাল সুতা মাত্র। সেই সূতার বলে তিনি রাজরাণীকে বলিয়াছিলেন তোমার রাজ্যের সকল মণি মুক্তা ঐশ্বর্য্যের ওজন ও আমার এই লাল সূতার সমতুল হইতে পারে না। বাল্যকালের পঠিত সেই কথাটা আজ সহসা কমলার মনে উদিত হইল। কমলা যুক্তকর হইয়া উদ্দেশে সেই দেবীর পায়ে একটী নমস্কার জানাইলেন, মনে মনে বলিলেন দেবী, আমার প্রাণে বল দাও, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি আজ

সতীর মত পতির পূজা করিব, সতীর মত পতীর গৌরবে রাজার গৌরব তুচ্ছ মানিব। কমলা স্বামীর পাদুখানির উপর দুই কর বিস্তর করিয়া স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "চাকরী ছাড়িতেই হইবে, কাল-ই ?"

দেবেন্দ্রনাথ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি ? তোমার এমন ভাব হলো কেন ?"

দরদর অশ্রু ধারায় গণ্ড প্লাবিত করিয়া স্বামীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া, কাতর কণ্ঠে সীমন্তিনী সাগ্রহে বলিলেন, "অনাহারে জীবন যা'ক, চাকরী ছাড়িতেই হইবে।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যথার্থ আর্য্য রমণী তুমি ; আর্য্যশোণিতোচিত একথা তোমার মুখেই শোভা পায় ! এখনও, আর্য্য-তেজোদম্ভ বাঙ্গালার গৃহের কোণে রমণী সমাজে থাকিলেও থাকিতে পারে, কারণ তাহারা অশিক্ষিত হইলেও, আজন্ম দাসত্বের পেষণে তাহাদের আত্মসম্মান একবারেই লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু আমরা আর আর্য্যবংশসম্ভূত বলে গৌরব করিবার অধিকারী নই। বহুকাল বিদেশীর দাসত্ব সার করে আমাদের শক্তি স্বাধীনতা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। তুমি স্ত্রীলোক, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে জান না, ভেবে দেখ, আমার একটী পয়সাও সঞ্চয় নাই, চাকরী ছাড়িলে কিসে চলিবে ? যদি শুধু তুমি আমি হতাম, তাহা হলে আমি চিন্তা কর্ত্তাম না, এখনই আমি চাকরীর মুখে পদাঘাত করে আত্মসম্মান বজায় রাখতাম। কিন্তু বৃদ্ধা মাতা, তিনটী অবগণ্ড শিশুর ভার আমার উপর ! কন্যার বিবাহের কাল নিকটবর্ত্তী, মাতাও বৃদ্ধা ; হিন্দুর সংসারে মাতৃদায়ও সহজ নয় ! এখন চাকরী ত্যাগ করি কিরূপে ? তবে অবশ্য এ সাহেবের চাকরী আর কর্ত্তে ইচ্ছা নাই ; অন্য চেষ্টা করে এটা ছেড়ে দেব মনস্থ করেছি !"

কমলা। অন্য সাহেব যে ভাল হবে তার কিছু বিশ্বাস আছে ?

দেবেন। তা বটে ; আচ্ছা কোনও দেশীয় লোকের চাকরী অন্বেষণ কর্‌ব।

কমলা। সে যা হয় করিও, কিন্তু এ চাকরী কালই ছেড়ে দিতে হবে।

দেবেন। আচ্ছা ভেবে দেখা যাক, মাকে এখন সকল কথা বলেনি, তার পর যা হয় করা যাবে।

কমলা। ভাব আর যাই কর, আমি আজ তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যতক্ষণ তুমি চাকরী ছেড়ে সাহেবের দাসত্ব হতে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ আমি অন্নজল স্পর্শ কর্‌বো না। স্বামী ম্লেচ্ছ পদসেবা ক'রে, ম্লেচ্ছের নিকট ইতরের ন্যায় লাঞ্ছিত হ'য়ে যে অন্ন উপার্জ্জন করেন, হিন্দু রমণীর পক্ষে তাহা অখাদ্য। যে জীবনরক্ষার জন্য, দেবতাকে পরের দাসত্বে বিক্রয় কর্ত্তে হয়, সে জীবন অনাহারে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

দেবেন্দ্র। কি বল্‌ছ কমলা ; তোমার এতদূর হবে তাত ভাবি নাই।

কমলা আজ বড় মুখরা ; কে যেন তাঁহার হৃদয় প্রস্রবণের বাধা সরাইয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, "হতভাগ্য সাহেব তোমায় প্রহার করেছে! আমি যদি হিন্দু রমণী হই, যদি স্বামীপদে আমার ভক্তি থাকে, তবে দুরাত্মা ম্লেচ্ছাধম ইহার উচিত ফল পাবে।"

আবেগে কমলার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, আর কথা বলিতে পারিলেন না। স্বামীর কাছে দাঁড়াইতেও যেন তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অতি ব্যস্তে কমলা সহসা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বিস্মিতনেত্রে বসিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন; কমলার প্রাণ কি এতই স্বাধীনতাপ্রিয়! সতীত্ব রক্ষার জন্য,—স্বামীর গৌরব, স্বজাতি, স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য আর্য্য-রমণীগণ যে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, কমলাকে দেখিলে তাহা বিশ্বাস হয়।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——:*:——

কমলা কক্ষান্তরে নির্জ্জনে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এমন চাকরী অবশ্য ত্যাগ করাইব। চাকরী ত্যাগ করিলে অন্ন বস্ত্র চলিবে না?— কেন চলিবে না? আমাদের গ্রামে কত লোকত চাকরী করেন না! তারাও ত খায় পরে, পরিবার প্রতিপালন করে। তবে কিছু কষ্ট হইতে পারে। ভাল খাওয়া পরা না মিলিতে পারে। নাই বা মিলিল, কোনওরূপে জীবন রক্ষা হইলেই হইল। তাঁহার ভয়, চাকরী ছাড়িলে অনাহারে মরিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ জাতির কি প্রাণ! এত অপমানে, এত লাঞ্ছনায়ও তারা চাকরী ত্যাগ করিতে পারে না? পুরুষে শুধু আপনাদের প্রাণের জন্য এতটা করে না; পরিবার প্রতি-পালনের জন্যই এতটা নহে! স্ত্রীপুত্রের প্রতি পুরুষ জাতির অপরিসীম স্নেহ! স্ত্রীপুত্রকে সুখী করিবার জন্য তারা এইরূপেই লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে; এই মর্ম্মান্তিক অপমানে জীবন জর্জ্জরিত করিয়া পুরুষে যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তদ্দারা-পরিবারের বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দেন। আর আমরা স্ত্রীজাতি কি অধম! যাঁরা আমাদের দেবতা, আমাদের জন্য যারা জীবন পাত করিতেও কুণ্ঠিত নন, আমরা সেই স্বামী দেবতাকে সাহেব বাড়ীতে এইরূপ ইতর গোলাম সাজাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে হীরা মণি পরি দুধ ঘি খাই! ঘরে দাসী আমাদের পদসেবা করে, দু'পা চলিতে আমাদের পায়ে বেদনা লাগে, আতর গোলাপ, কুন্তলীন নইলে আমাদের দিন কাটে না। এ সব কোথা থেকে আসে? আমাদের

স্বামীর,—দেবতার গোলামী হতে! যাঁহারা আমাদের উপাস্য, যাঁহাদের পদসেবা আমাদের স্বর্গলাভের সোপান, যাঁহাদের পদধূলি আমাদের চতুর্ব্বর্গ লাভের আশীর্ব্বাদ, তাঁহারা বিদেশী, বিধর্ম্মী জাতির পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া, তাহাদের কাছে ইতর পশুর ন্যায় পীড়ন সহ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, আমরা সেই অর্থে আমাদের বিলাসিতা সাধন করি! ছি ছি! আহা! সাহেবেরা যখন বাবুদিগকে এইরূপ গালি দেয়, অপমানিত করে, তখন তাঁহাদের অন্তরে কি করে? যে স্ত্রীপুত্রগণের ভরণ পোষণের জন্য তাঁহারা এই লাঞ্ছনা ভোগ করেন, তখন তাঁহাদের মনে সেই স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু কামনা কি আসে না? এতকাল এসব বুঝি নাই। আমরা চাকুরে স্বামীর গৃহিণী হ'লে গৌরব করি। গ্রামের ইতর লোকের ঝি বউ দেখ্‌লে তাহাদের অবহেলা করি। ধিক আমাদের গৌরবে! সেই আমাদের পাড়ার নয়ন সাহার স্ত্রী, আপন হাতে কাঠ কাটে, মাঠে গরু রাখে, ধান ভানে; তার স্বামী মাঠে চাষ করে, দুপুর সন্ধ্যায় বাড়ী আসে। ভাল মাছ তরকারী রেঁধে, সাহা বউ মেটে বাসনে স্বামীকে খাওয়ায়। দুবেলা আধ সের ঘন আটা খাটি দুধ স্বামীর পাতে ঢেলে দেয়! সে কি আমার অপেক্ষা ছোট? সে কি আমার অবহেলার পাত্রী? আজ বুঝিয়াছি, সে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখী, তার স্বামী মুর্খ চাষা সত্য, কিন্তু পরের গোলাম নয়, পরের পায়ের ধূলা তার মাথায় উঠে না, স্বামী দেহের রক্ত পরকে বিকাইয়া তাকে অন্ন যোগায় না। সে বড় না—আমি বড়? নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই আর প চাকরী করিতে দিব না। অনাহারে মরিতে হয় মরিব। ভিক্ষ: ছেলে মেয়ে বাঁচাতে হয়, বাঁচাব, বাস্তুবাটী বেচিতে হয়, তাহাও স্বীকার। এর চেয়ে ভিক্ষা মন্দ কি?

কমলা ভাবিয়া মন খুব দৃঢ় করিয়া আবার স্বামীর গৃহে গেলেন; দেখিলেন দেবেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শায়িত। ঘুমাইয়াছেন, ভাবিয়া আর তাঁহাকে ডাকিলেন না। আস্তে আস্তে প্রদীপটী নিবাইয়া কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কমলার ঘুমাইতে ইচ্ছা হইল না। আজ অনেক পূরাণ কথা তাঁহার মনে আসিতে লাগিল। কমলার বয়স এই ত্রিশ একত্রিশ বৎসর; বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি দশ বৎসরের বালিকা, তখনকার কথা মনে আসিল। তখন তাঁহার পিতামহী জীবিত ছিলেন। তাঁহার কাছে কমলা শুনিয়াছেন, পিতামহ দুর্গানন্দ রায় কখনও চাকরী করেন নাই। তাঁহার হাল গরু ছিল, চাকর রাখাল ছিল; জমি জমাও অনেক ছিল। তাহাতে বড় বড় তিন গোলা ধান ফলিত। কত অতিথি কুটুম্বে খাইত; আত্মীয় বাড়ী বার্ষিক যাইত; কত পূজা পার্ব্বণ চলিত। তাই বলিয়া তিনি মূর্খ ছিলেন না। গ্রামের সকলেই তাঁহার কাছে মামলা মোকদ্দমা, সভা সামাজিকতা, বিবাহ অন্নপ্রাশন প্রভৃতির পরামর্শ লইতে আসিত। তাঁহার বাড়ীতে অধ্যাপক পণ্ডিত টোল করিতেন। তিনি টোলের ছাত্রগণকে পাঠ বলিয়া দিতেন। তখন মেয়েরা রূপার বালা হাতে পরিত। পিতামহীর বালা ও মল ছাড়া আর অলঙ্কার ছিল না। ঠাকুর মা মাঝে মাঝে চরকায় সূতা কাটিতেন, আর আগেকার গল্প করিতেন। তিনি বলিতেন, সেকালে মেয়েরা সূতা কাটিয়া তাঁতি বাড়ি দিত, তাঁতিরা কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিত। পারিশ্রমিক স্বরূপ ধান লইয়া যাইত। অন্ন বস্ত্রের জন্য চাকরীর আবশ্যক হইত না। কমলা ভাবিলেন, তেমন দিন কি দেশে আর হইতে পারে না? তারপর বাবা চাকরী করিতেন, জ্যেঠা মহাশয় বাড়ীতে থাকিতেন। বাবা যে জমিদারের চাকরী করিতেন, তিনি ত বাবাকে তেমন অনাদর করিতেন

না। বাবাকে তিনি কত সম্ভ্রম করিতেন, আমাদের বাড়ী পূজা পার্ব্বণ নিমন্ত্রণে তিনি আসিতেন। কেমন ভদ্রভাবে কথা বলিতেন। আমি মায়ের সঙ্গে দুইবার তাঁদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছি, তাঁহারা আমাদিগকে কত আদর করিয়াছেন! সে চাকরীতে আমাদের সংসারত বেশ চলিত! তাতে এমন পোষাক পরিচ্ছদ লাগিত না; দশটার সময় এমন ভাবে ছুটিতে হইত না; অথচ পয়সাও হইত। যদি চাকরী করিতে হয়, ভদ্রলোকদের এমনি চাকরীই করা উচিত। এ ম্লেচ্ছের চাকরী, এ হৃদয়হীন পাষণ্ডের চাকরী ত্যাগ করিতেই হইবে।

কমলার বড় উদ্বেগ হইল। সমস্ত রাত্রি কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। শেষ রাত্রিতে খোকা কাঁদিয়া উঠিল; স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার ভয়ে কমলা উঠিয়া গিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাছে শুইলেন। মাতা জিজ্ঞাসিলেন, "এত রাত্রিতে উঠে এলে কেন বউ মা।"

কমলা। খোকা বড় কাঁদ্‌তে লাগল, আমারও ঘুম আস্‌ছে না।

মাতা। তোমার কথার ভাব অমন কেন মা? দেবেন কি তোমায় কিছু বলেছে? কাল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে কি বল্‌ছিল?

কমলা ভাবিলেন মায়ের কাছে সব বলিবেন, বলিতেই আসিয়াছিলেন। একথা শুন্‌লে মাও অবশ্য পুত্রকে চাকরী ছাড়্‌তে বল্‌বেন। আমার কথা শুনুন আর নাই শুনুন, মাতার কথা অবশ্য শুনিবেন। আফিসে যাহা ঘটিয়াছে, কমলা যেরূপ শুনিয়াছিলেন সমস্তই শাশুড়ীর কাছে বলিলেন। পরে তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া বড় কাতরে, "মা! এমন চাকরী ছাড়িতে অনুরোধ করুন। আপনি বলিলে অবশ্য শুনিবেন।"

পুত্রের এবম্বিধ লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া মাতা দুঃখিত হইলেন; সাহেবকে গালি দিলেন; কিন্তু বলিলেন, "চাকরী ছাড়িলে কিরূপে চলিবে আমার দেবেনের ত নগদ কিছু সঞ্চয় নাই।"

কমলা। যেরূপেই হ'ক চল্‌বে। ঠাকুরত কোনও দিন চাকরী কর্ত্তেন না। তাঁরওত চল্‌ত। দেশেত আমাদের জমি ক্ষেত আছে।

মাতা। চল্‌ত বটে, স্বচ্ছল ভাবে নয়। কখন কখন ধার দেনাও হ'ত।

কমলা। আবার পূজা পার্ব্বণেত বেশ খরচ হ'ত।

মাতা। তেমন দিন কি মা এখন আছে? তখন দশ টাকায় যা চল্‌ত, এখন এক শত টাকায় তা চলে না।

কমলা। আমার বোধ হয়, এখনও তেমন ভাবে চলে। আগেকার চেয়ে লোক দশ গুণ বিলাসী হয়ে পড়েছে, তাই এত টানাটানি। এখন বাজে খরচই বেশী।

মাতা। তার পর, আবার দেবেনের মেয়ের বিয়ের দায় আছে। ফুলের বয়স এই বার বৎসর। এখনকার মেয়ের বিয়ের কি ব্যাপার, তা'ত জান।

কমলা। জানি মা, কিন্তু সে ভার আমার উপর রহিল। ফুলের বিয়ের জন্য তাঁকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না।

মাতা দীনময়ী পুত্রবধূকে বড় ভালবাসিতেন। শুধু ভালবাসিতেন না,—বধূর জ্ঞান বুদ্ধি কার্য্যদক্ষতার উপর তাঁহার অচল আস্থা ছিল। কমলার ন্যায় পুত্রবধূ পাইয়া তিনি সর্ব্ববিষয়েই গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। কমলা সমর্থা হইলে পর তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র দেবেন্দ্রনাথেরও সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতেন না; বধূর উপর পুত্রের সুখ স্বাচ্ছন্দের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে পৌত্র পৌত্রী ও পূজা আহ্নিক লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি জানিতেন কমলা যেরূপ দেবেন্দ্রনাথের সেবা করিতে পারে, যেরূপে তাহার সুখ দুঃখের অনুগামিনী হইয়া চলিতে পারে, সেরূপ তিনি মা হইয়াও

পারেন না। কমলা যেরূপ সংসারের শৃঙ্খলা করিতে পারে, অনেক পরিপক্ক গৃহিণীও সেরূপ পারে না। কমলা স্বয়ং লক্ষ্মী। কমলা ঘরে আসিলেই দেবেনের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে; কমলার মুখ অন্ধকার দেখিলে মাতার বুকে বড় বাজিত। কমলার অতি ক্ষুদ্র আবদারটুকুও পূরণ করিতে না পারিলে তিনি স্বস্তি পাইতেন না। তিনি ভাবিলেন বুদ্ধিমতী কমলা যখন চাকরী ছাড়িবার জন্য এত আগ্রহ করিতেছে, তখন দেবেন চাকরী ছাড়িয়াই দিক্। তাইত, আমার সোণার চাঁদ দেবেন্দ্রকে মুখপোড়া সাহেব মেরেছে! কাজ নেই এমন সাহেবের চাকরী করে! দেবেন্দ্র ত আর অক্ষম ছেলে নয়, কত চাকরী জুটবে।

রাত্রি ভোর হইল। মাতা উঠিয়া প্রাতঃস্নানের উদ্যোগ না করিয়াই আগে দেবেন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া ডাকিলেন, "দেবেন! উঠেছ?" দেবেন তখন শয্যার উপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। মাতা দেখিলেন পুত্রের মুখ আজ কেমন বিবর্ণ। চক্ষু দুইটী যেন বসিয়া গিয়াছে। আমার সোণার চাঁদকে সাহেব অপমান করেছে! ছেলে, অপমানে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। মায়ের স্নেহের বুকে আঘাত লাগিল। বলিলেন, "দেবেন, তুই যেন রাত্রিতে ঘুমুস নি?"

দেবেন্দ্র। রাত্রিতে অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আন্‌তে পার্‌লুম না। মনটা বড়ই খারাপ ছিল।

মাতা। এদিকে বউ মাও সমস্ত রাত্রি জেগেছে। আমাকেও ঘুমুতে দেয় নাই। দেবেন, বউ মা যা বল্লে তা কি সত্যি? সত্যি সত্যিই কি অল্পেয়ে সাহেব তোকে মেরেছে?

দেবেন্দ্র। সত্য বই কি মা! অন্নদাস বাঙ্গালীর পক্ষে কোনও অপমানই মিথ্যা নয়! অপমানে প্রাণ খাক হয়ে যাচ্ছে, সর্ব্বদাই মনে

হচ্ছে, অধম অন্নের কাঙ্গাল গোলামের জাতি বাঙ্গালী কেন স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসারে বাস করে? আজ যদি আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার না থাকৃত, তা হ'লে আমি সে পাষণ্ড ফিরীঙ্গির মুখে পদাঘাত করে, মনের জ্বালা জুড়াতেম্। কিন্তু কি কর্‌ব, কয়েকটী অপগণ্ড শিশুর ভার আমার মস্তকে।

মাতা। যা হয় হ'ক আজই চাকরী ছেড়ে দাও। এমন চাকরীতে কাজ নাই।

দেবেন্দ্র। আমি চাকরী ছেড়ে, বৃদ্ধা মাতাকে কি অনাহারে মর্‌তে দেখ্‌ব!

মাতা। কোনও কষ্ট হবে না; যা'র জীব তিনিই আহার দেবেন। তুমি চাকরী না ছাড়্‌লে বউ মা অন্ন জল গ্রহণ কর্‌বে না।

দেবেন্দ্র। মা! তোমারও কি ইচ্ছা, আমি চাকরী ছেড়ে দেই? তবে আমি চাকরী ছাড়লুম্। মাতৃ আদেশ শিরে ধরে আমি আজ গোলামী হ'তে মুক্ত হব।

মাতা সন্তুষ্ট হইলেন। কমলার বুকের ভার নামিয়া গেল। এতক্ষণ পরে তিনি খোকার মুখ চুম্বন করিয়া হাসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*:•:*—

আফিসে গিয়াই দেবেন্দ্রনাথ চাকরী ইস্তফা দিলেন। সাহেব দুই একবার রুক্ষ নজরে চাহিল; তার পর মিষ্ট কথায় বলিল, "বাবু চাকরী ছাড়িও না, উপরওয়ালা কিছু বলিলে অপমান বোধ করিতে নাই। চাকরদের ভালর জন্যই মুনিবে তিরস্কার করে থাকেন।" দেবেন্দ্রনাথ সাহেবের কোনও মুরুব্বী-আনাই গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু বাবু বড় কর্ম্মের লোক; ছাড়িয়া গেলে হউসের ক্ষতি হইতে পারে। অগত্যা সাহেব ব'লিল, "বাবু! কাল আমার মেজাজটা ভাল ছিল না, আমায় মাপ কর।"

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞা অটল। মাতা বনিতার স্নেহ রসাভিষিক্ত উত্তেজনায়, যাহার হৃদয়ে স্বাধীনতা তেজ উদ্দীপিত হয়, তাহার হৃদয় সহজে দমিতে পারে না। মাতার হাতের অসি ধরিয়া, পত্নীর হাতের বরমাল্য পরিয়াই আর্য্যবীরগণ স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারিয়াছিলেন।

অগত্যা সাহেবকে ইস্তফা গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু অতি রুক্ষ নজরে তীব্র কণ্ঠে বলিল, "এ তোমার ভাল হইল না।"

চার্জ বুঝাইয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথ আজ সকাল সকাল বাসায় ফিরিলেন।

বাবুদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া বলিল, "এমন চাকরীটি ছাড়িয়া দিলেন?" দেবেন্দ্রনাথ আজ সকলকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। তাঁহার প্রাণে যেন আজ অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। জীবনের এক মাত্র অবলম্বন চাকরী,—যাহাতে তিনি ত্রিশ টাকায় প্রবেশ করিয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় দেড় শত টাকায় উন্নমিত হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তিন শত টাকা পর্য্যন্ত যাহাতে নিশ্চিত আশা ছিল, যাহা ছাড়িয়া দিবার কল্পনা করিতে কাল এমন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ জগৎ আঁধার দেখিতেছিলেন, যাহার মায়ায় সাহেবের পাশবিক অত্যাচারেও স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন,—সেই দুর্ব্বল বাঙ্গালীর একমাত্র সম্বল—চাকরী ছাড়িয়া আজ তাঁহার মনে বিমল আনন্দের উদয় হইল! কে যেন তাঁহার হস্তপদের দীর্ঘ কালের বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল—দীর্ঘ কালের কোন পূতিগন্ধময় অন্ধকার কারাগার হইতে তাঁহাকে যেন মুক্ত বায়ুতে স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "আমার মতন মাতা পত্নী লাভ যদি সকল বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিত, তবে কি বাঙ্গালীর এত দুর্দ্দশা হয়?" অতি ব্যস্তে দেবেন্দ্রনাথ বাসার দিকে ছুটিলেন, দাসত্বমুক্ত স্বাধীনজীবনে মাতৃদেবীর চরণে প্রণাম করিতে;—এ সংবাদে আনন্দোৎফুল্ল কমলার বিকশিত মুখপদ্মের মধুর হাস্যচ্ছটা দেখিতে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে বিলম্ব অসহ্য হইল।

বাসায় পৌছিয়াই দেখিলেন, মাতা ও পত্নী দ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কমলার দিকে চাহিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু হাসিলেন। কমলার হৃদয়ভার প্রবল-বায়ু-সঞ্চারে মেঘ রাশির ন্যায় সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল! দেবেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়াই মায়ের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "মা! তোমার আদেশে আমি দাসত্ব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর দাসত্বে মন না যায়।

মাতা খুসী হইলেন, “দীর্ঘজীবী হও” বলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে বধূকে বলিলেন, “চল মা, এখন চারটী খেয়ে নাও। এই দু’দিনের মধ্যে অভাগার বেটী একটু জলও মুখে দেয় নাই।” কমলার যেন আহারে ইচ্ছা নাই; তাঁহার ইচ্ছা এখন স্বামীর কাছে বসিয়া তাঁহার একটু সেবা করেন। দেবেন্দ্রনাথ একটু ধমকাইয়া বলিলেন, এই ভয়ঙ্কর গরম, এরূপ উপবাস করে একটা অসুখ বিসুখ না বাধিয়ে কি ছাড়্‌বে!”

অগত্যা ঝিকে ডাকিয়া স্বামীর সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া কমলা আহারার্থে গেলেন। অতি ব্যস্তে আহারাদি সমাপন করিয়া, অন্যান্য কাজ ফেলিয়া, কমলা স্বামীর কাছে আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন কমলার এক হাতে অলঙ্কারের বাক্স, আর হাতে শাড়ী সেমিজ জামা। দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, “পর, আজ একবার বস্ত্রালঙ্কার পর। আজ আমি দাসত্বমুক্ত, রাজরাজেশ্বর! তুমি আজ রাজরাণী! আজ তোমার বেশ ভূষায় বড় মানাবে; সেজে এস, আমি দেখে সুখী হইব।

কমলা তাড়াতাড়ি বস্ত্রালঙ্কার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিয়া নিজেও সেই পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু দিয়া দর্ দর্ ধারায় জল ঝরিতে লাগিল, কে যেন বর্ষাকালের জলভরা নলিনী সহসা সজোরে নাড়াইয়া দিল। কমলার কথা বলিতে বিলম্ব হইল; দুই চারিবার ঢোক চাপিয়া, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রশমিত করিয়া, কহিলেন, “প্রভু! আমায় ক্ষমা কর! তুমি কি মনে করিয়াছ, আজ আমি অলঙ্কার পরিতে আসিয়াছি? এ সব অলঙ্কার নয়,—আমার আজীবন সঞ্চিত পাপের বোঝা মাত্র! তুমি পরের দাসত্ব করিয়া, নিষ্ঠুর প্রভুর মর্ম্মভেদী তাড়না সহ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ; আমি সেই অর্থদ্বারা আমার বিলাসের সজ্জা প্রস্তুত করিয়াছি। স্বামী ম্লেচ্ছের পদ-

ধূলি মাথায় করিতেছেন, দাসী আতর গোলাপে অঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া সোণা মণিতে বাহার উড়াইয়া, অহঙ্কার করিতেছে! বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগের এ কি ভয়ঙ্কর ভুল। নিদারুণ দাসত্বে, অভাবে অর্থ চিন্তায় পুরুষ রক্ত জল করিয়া আয়ুক্ষয় করিতেছেন, আর সাড়ী সেমিজ পরিয়া সোণা মণিতে সাজিয়া, আল্তা পমেটম্ মাখিয়া স্ত্রী গরব করিতেছে! বঙ্গরমণীদিগের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে জানি না। কিছুই জানিতাম না, আজ সব জানিয়াছি! তুমি প্রভু, আমি দাসী; আমায় ক্ষমা কর। আজ আমি তোমার পদ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, কেবল লজ্জা নিবারণের সাড়ি আর এয়োতির শাঁখা ব্যতীত আর আমি কোনও আভরণ গায়ে তুলিব না। আমার পুত্র কন্যাকেও পরিতে দেব না। সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার তুমি লও, আজই এ সকল বিক্রয় কর। যাহা পাইবে, তাহাদ্বারা কোনও ব্যবসায় কর; দেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে চলিবে!"

দেবেন্দ্রনাথের চক্ষে ধারা ছুটিল। অপার আনন্দ-স্রোত তাঁহার বক্ষে তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। অশ্রুসিক্ত লোচনে প্রিয়তমার কর ধারণ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "কমলা! তুমি আমায় দিব্য চক্ষু দান করিলে। আমি অন্নের কাঙ্গাল, পরের গোলাম, হীন বাঙ্গালী বলে আত্মাকে অত্যন্ত ধিক্কার দিতেছিলাম। কিন্তু এখন জানিলাম আমি সামান্য নই, অতুল গৌরবের অধিকারী। যে ব্যক্তি তোমার স্বামী, তার জীবন কখনও ঘৃণিত হইতে পারে না। আজ বুঝিলাম, বাঙ্গালা দেশকে লোকে যতটা হীন ভাবে, ততটা হীন নয়। বাঙ্গালার অন্তঃপুরে এখনও স্বাধীনতাবহ্নি প্রচ্ছন্ন আছে! বঙ্গরমণী হৃদয়ের এই প্রচ্ছন্ন অনল প্রজ্জ্বলিত হইলে, সংসারে সর্ব্বজাতির গৌরব ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।"

পিতা মাতার কথার ভাব, চক্ষের জল দেখিয়া খোকা সুরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়া গিয়াছিল ; শিশুর ধৈর্য্য অধিকক্ষণ থাকিল না। সে পিতার কোলে উঠিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া হাসিয়া কুটি কুটি হইল। দেবেন্দ্র নাথ পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "শুন কমল ! আজ সহসা অনেক কথা আমি বুঝে ফেলেছি ! বুঝ্‌তে পেরেছি সাহেব জাতি কি ধূর্ত্ত কি চতুর ! আর আমরা বাঙ্গালী কি মুর্খ ! কি অপদার্থ ! এই যে আমরা সাহেবের পদাঘাত খাইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, তাহার অধিকাংশই আবার সাহেবের ঘরে সাধিয়া ডালি দেই। আমার কথাই আমি বলি। আমি দেড় শত টাকা বেতন পাই ; কিন্তু আমার জামাটী ঐ সাহেব বাড়ীর, জুতা, ছাতা, ছড়ি, ঘড়ি, কাপড়, মোজা সবই ঐ সাহেব বাড়ীর। ছুরি, কাঁচি, চুরুট, নোটবুক সমস্তই সাগর পারের। স্ত্রীর গয়নাও সাহেব বাড়ীর না হইলে পছন্দ হয় না। খাবার দ্রব্য, তাও মা জন্মভূমির প্রসাদে আর তৃপ্ত হয় না। সাহেব বাড়ীর বিস্কুট, সাহেব বাড়ীর জমাট দুধ না হলে ছেলে পিলের স্বাস্থ্য থাকে না। কত আর বল্‌ব ? মোট কথা যাহা উপার্জ্জন করি, তাহার তিন ভাগই আবার সাহেবের ঘরে ফিরাইয়া দেই। সাহেবের কি চতুরতা ! আর আমাদের কি মুর্খতা। যা হ'ক কমল, আজ আমিও তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, আর কখনও আমি বিলাসের দাস হইয়া—ঘরের ধন সাগরে ভাসাইব না।"

এখানে বলিয়া রাখা উচিত, আমাদের আখ্যায়িকার ঘটনাকালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদও হয় নাই, স্বদেশী আন্দোলনেও বাঙ্গালীর প্রাণ মাতিয়া উঠে নাই। তবে বাতাসটা একটু ফির্‌বে ফির্‌বে করিতেছিল বটে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

।—ঃ*ঃ*ঃ—

সুদূর পল্লীগ্রামে—যেখানে শস্য-শোভায় মাঠ হাসে, বাগানে গাছে গাছে ফল ঝোলে, সমীরণ অবাধে লতা পুষ্প লইয়া খেলে, যেখানে রাস্তা কাঁচা, তাহাতে দিনে ছায়া, রাত্রিতে অন্ধকার, গ্রীষ্মে ধূলা নাই, বর্ষায় কাদা,—যেখানে সরোবরে নির্ম্মল জলের মূল্য নাই, বাজারে শাকশব্জী কিনিতে পাওয়া যায় না, ক্ষেতে প্রস্তুত করিয়া লইতে অথবা পড়শীর বাড়ীতে চাহিয়া লইতে হয়; যেখানে বর্ষার বন্যার জল কানে কানে ভাসে, বসন্তে বোল্‌ভরা আমের গাছে কোকিল দল পালে পালে ডাকে, শীতে ধানের আটি-মাথায় কৃষক দল ভারে ভারে চলে, এমন একটী অজানা রকম পল্লীগ্রামে দেবেন্দ্রনাথের জন্মস্থান। দেবেন্দ্রনাথের পিতামহ রামসুন্দর ঘোষের কুলে-শীলে বড় নাম ছিল। ঘোষের বাড়ীকে গ্রামের সকলে তালুকদার বাড়ী বলিত; রামসুন্দর ঘোষ তালুকে ত্রিশ ঘর প্রজা বসাইয়াছিলেন, ধানে চালে দুই শত টাকার উপরে মুনফা পাইতেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতাও তাহা লইয়া বংশের গৌরব এক-প্রকার রক্ষা করিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া ৩০৲ টাকা বেতনে সাহেব কোম্পানীর বাড়ী কেরাণী হইলেন। যে বার তাঁহার বেতন ৫০৲ টাকা হয়, সে বার তিনি একবার পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুরাণী পুত্রবধুকে কাছে

না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, অগত্যা কিছুদিন বাদে কমলাকে বাড়ী পাঠাইতে হইল। এই সময়ে তাঁহার হাতে কিছু টাকা জমিল; কিছু অলঙ্কার গড়িলেন, কিছু তৈজসপত্র করিলেন; কিছু সঞ্চয়ও হইল। যে বৎসর তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা হইল, সেই বৎসর পিতা স্বর্গলাভ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে কিছু ধারও করিয়া, পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া—একবারে মাতা ও পত্নীকে লইয়া কলিকাতাবাসী হইলেন। তার পর সাহেব খুসি হইয়া তাঁহার বেতন দেড় শত টাকা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার একটী পয়সাও বাঁচে না। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা দুই এক বৎসরে শোধ দিতে না পারিয়া খাস খামারের যে জমি ছিল, তাহা মৌরসি দিয়া শোধ করিলেন। তবে দেশের বাড়ী ঘরগুলি একবারে ছাড়েন নাই; গ্রামের এক জন অন্তরঙ্গের কাছে টাকা পাঠাইয়া তাহার যত্ন করিতেন।

যাহা হউক, দুই চারি দিনের মধ্যে, সমস্ত গুছাইয়া বাড়ীভাড়া চুকাইয়া, তৈজসপত্রের অধিকাংশ বেচিয়া—দেবেন্দ্রনাথ দেশে যাত্রা করিলেন। কমলার অত্যন্ত আগ্রহে বাধ্য হইয়া, তাঁহার বস্ত্রালঙ্কার-গুলিও বিক্রয় করিলেন!

বাড়ীতে গেলে, গ্রামের প্রধান চাকুরে বাবু দেবেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া, প্রধান প্রধান লোক দেখা করিতে আসিল। বৃদ্ধেরা আসিলেন,—স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে, সামাজিকতা বজায় রাখিতে। সমবয়স্কেরা আসিলেন সাক্ষাৎ করিতে, আমোদ করিতে, হয়ত একটী বান্ধব-ভোজ হইতে পারে, তাহার ভাগী হইতে। শিক্ষিত যুবকেরা আসিলেন, গ্রামের শিক্ষা সংস্কারের কথা বলিতে, বালকেরা আসিল, "ক্রীড়া সমিতির" সাহায্য চাহিতে। গরিব দুঃখীরা আসিল দুরবস্থা জানাইতে।

যখন শুনিলেন, দেবেন্দ্রনাথ চাকরী ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তখন অনেকেই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু দেবেন বাবু স্বেচ্ছায় চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা কেহ বিশ্বাস করিলেন না। এমন কি আজ কাল কেহ ছাড়ে? নিশ্চয়ই চাকরী হইতে অপরাধের জন্য বরখাস্ত হইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথও বিশেষ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কেবল একজন বৃদ্ধ চাষালোক,—তিলক সাহা,—সে গ্রামের মধ্যে অতি বৃদ্ধ, অনেক পৌত্র দৌহিত্রের অধিকারী—অনেকে তাহাকে ভাগ্যবান্ বলে, চাষা হইলেও তাহাকে সকলে আদর করে,—সেই বলিল, "বাবু বেশ করেছ!"

দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ করেছি কি শা' দাদা! দেড়শ টাকার চাকরী ছেড়ে দিলুহ, কাজটা কি ভাল হয়েছে?"

তিলক। ভাল বই কি দাদা! তোমার বাবা দাদারও ত দিন চলেছিল। চিরকাল বিদেশে পড়ে চাকরী করে টাকা উপায় কর, তাতে কি দাদা মান হয়? তোমার বাবা দাদার যে খাতিরটুকু ছিল, তাকি তোমার আছে? তোমায় কে চিনে? তোমার দাদা রামসুন্দর তালুকদারের নামে সব সেলাম কর্‌ত। আমি আজকার নয় দাদা, তোমার দাদা মশাই আমায় কত ভাল জান্‌তেন। বেশ করেছ ভাই! এখন দেশে থেকে বাপ পিতামহের মতন দেশের কাজ কর, স্বধর্ম্মে চল, নামও হইবে, সুখেও দিন যাবে।"

তিলক সাহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের অনেক কথা হইল। পুরাতন কাহিনী বলিতে তিলক সাহা নিরক্ষর হইলেও সিদ্ধকণ্ঠ। গ্রামে কার বাবার শ্রাদ্ধে কেমন ঘটা হইয়াছিল, কাহার বিবাহের সময় বর কন্যার পক্ষে ভয়ানক লড়াই হইয়াছিল, কাহার বাড়ীতে কিরূপ অতিথি সেবা হইত; কোন্ লাঠিয়াল একাকী একশত জনের মোহাড়া

দিতে পারিত; কোন্ দয়াবান ব্যক্তি জলকষ্ট নিবারণের জন্য কোন্ পুষ্করিণীটী খনন করিয়াছিলেন, তিলক সাহা তাহা চাক্ষুষ দ্রষ্টার মতন বিবৃত করিতে পারিত। দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী বড় কুলীনের মেয়ে; সে গ্রামের জমিদার তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন,—জমিদার হীন বংশজ। অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কন্যার পিতা দম্ভের সহিত বলিয়াছিলেন, [illegible] কুল কেনা যায় না; জমিদারের লাখ [illegible] সঙ্গেও আমার কন্যার তৌল হইতে পারে না। [illegible] এ গল্পও বেশ বিনাইয়া বলিল। দেবে[illegible]হিনীর ন্যায় সমস্ত শুনিয়া সুখী হইলেন।

এ[illegible] আসিলেন। বুড়ীরা আসিলেন,—চাকুরে বা[illegible]না দেখিয়া বাহিরে গিয়া বাখানা করিবার জন্য [illegible] কমলার তেমন ভাবটী আর নাই। সেই সেকেলে [illegible]রা শাঁখা-হাতে সাদা সিঁদে বাঙ্গালী মেয়ে,—সকলেরই প্রতি [illegible], সেবাপরায়ণা। প্রবীণারা ভাবিলেন, দেবেনের চাকরী নাই, তেমন অবস্থা আর নাই, তাই গিন্নীর বাবুয়ানা খসিয়াছে। যুবতীরা আসিয়াছিলেন একটু ভয়ে ভয়ে,—কলিকাতাবাসী চাকুরের গৃহিণী যদি তাঁহাদের পাড়াগেঁয়ে আদব কায়দা দেখিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করেন,—তাঁহাদের সামান্য বেশ ভূষা দেখিয়া উপহাস করেন! কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, কমলা আর তেমনটী নাই; তাঁহার পরণ পরিচ্ছদের কিছুমাত্রও পারিপাট্য নাই। তিনি সকলকে যথাবিধি আদর করিয়া সকলের খোকা খুকীকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিয়া, কত বিনয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। যুবতীরাও প্রাচীনাদিগের ন্যায় কানাকানি করিলেন, "সব গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে!"

সেদিন সব চলিয়া গেল। পরদিন বামা ঠাকুরাণী নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী আসিলেন। এখানে বামা দেবীর বিষয় কিছু বিবৃত করিয়া, আমরা পরে আমাদিগের আখ্যায়িকা আরম্ভ করিব।

বামা ঠাকুরাণী বালবিধবা, কোনও দিন স্বামীর ঘর করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। চিরকাল পিতৃগৃহেই বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পিতার আর কেহ ছিল না; কি[illegible] কন্যার সেবা শুশ্রূষায় সুখে কাটাইয়া. বালবিধবা কন্যার [illegible] ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ মহাযাত্রা করিয়াছিলেন। তখ[illegible] বাইশ বৎসর। সেই হইতেই পিতার বাড়ী বামার [illegible]ণে তাহার বয়স পঞ্চাশ কি তাহার অধিক হইয়াছে। [illegible]র জমি ক্ষুদ্র একখানি কুটীর. একটী দুগ্ধবতী গা[illegible]লা, আর সামান্য কিছু কাঁসা পিতলের বাসন ভিন্ন বা[illegible] কোনও সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারেন [illegible] পিতৃদত্ত ধনে তিনি অধিকারিণী ছিলেন,—সেটা সা[illegible] ব্রহ্মচর্য্য। পিতা বিধবা কন্যাকে বর্ণজ্ঞান শিখাইয়া রামায়ণ[illegible] পড়িবার মত বিদ্যাবতীও করিয়া গিয়াছেন।

পিতার মৃত্যু হইলে, অনেক অন্তরঙ্গ ব্যক্তি আসিয়া বামার রক্ষ[illegible] বেক্ষণের ভার লইতে চাহিলেন! অনাথা যুবতীর একাকিনী থাকা নিতান্ত অন্যায় ভাবিয়া অনেকে তাঁহাকে স্বগৃহে আশ্রয় দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বামা তাহাতে সম্মত হইলেন না। বিশেষ একজন চরিত্রবান্ আত্মীয় যখন বলিলেন, "মা! তোমার সাহস আছে তা জানি; কিন্তু স্ত্রীলোকের ইজ্জত সে নিজে রাখ্‌তে না জান্‌লে অপরে কি তা রেখে দিতে পারে? দুর্দ্দান্ত রাবণের অশোকবনে একাকিনী সীতার ইজ্জত কে রেখেছিল?" যাহা হউক গ্রামের লোক ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না।

অনেকেই বামা দেবীর উপর কঠোর চক্ষু রাখিলেন; অনেকেই পাপমুখে বলিতেন ওসব মেয়েমানুষের চাতুরী মাত্র! কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, বামা হিন্দুর ঘরেরই মেয়ে বটে।

সংসারে বামার কেহ ছিল না,—আবার অনেকেই ছিল। গ্রামের বালক বালিকারা সর্ব্বদাই বামা ঠাকুরাণীর বাড়ীতে হাট মিলাইত। বামাদেবীর ছোট বাগানটীতে কুল, আতা, দাড়িম, পিয়ারা, শসা, তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড়, আম, কাঁটাল প্রভৃতি নানাবিধ ফল ফলিত; সমস্তই তাঁহার স্বহস্তে রোপিত, সযত্নে পালিত। এই সমস্ত ফলের কিয়দংশ ইষ্টসেবায় ব্যয় হইত,—অধিকাংশই বাল্যভোজে লাগিত। কাজেই বামা দিদি বা বামা পিসীর বাড়ী না যাইতে পারিলে, ছেলে পিলেদের ঘুম হইত না! বামাদেবী চতুরাও ছিলেন, শুধু ফল খেতে দিয়া ছাড়িতেন না; তাঁহার বাগানে একটু জল না দিয়া, বা তৃণগাছা ঘাস না তুলিয়া কাহারও পলাইবার যো ছিল না। যে ফলটী পোকা বা ডাঁসা বা কাক কোকিলে যেটীর কিয়দংশ করিয়াছে, বামাঠাকুরাণী সেইটিই নিজে খাইতেন। কেহ যদি বলিত, তুমি আপনার প্রাণটীকে কিছু দেবে না, তবে এ সব কর কেন? বামাদেবী হাসিয়া বলিতেন, কি করি, ছেলেগুলিতে খেয়ে ফেলে; ছেলেগুলি ভারি নচ্ছার।

আর ছিল বামাদেবীর সেই পৈত্রিক গাভীটির বংশজাত কয়েকটী গরু। পুত্র পৌত্র লইয়া সংসারের লোক যতটা ব্যস্ত থাকে, বামা-ঠাকুরাণী তাহাদিগকে লইয়া তার চেয়ে অধিক ব্যস্ত থাকিতেন কোনও দিন তাহার একটী গাভী বা বৎসের ভাব ঝিম্‌ঝিমে দেখিলে, বা ঘাসে তাহাদের পেট পুরে নাই বোধ হইলে বামাদেবীর সে দিন

নিদ্রা হইত না। কোনও গাভী সন্তঃ সন্তান প্রসব করিলে বামাদেবী স্নানাহ্নিক করিবার সময় পাইতেন না। সেই গাভীর সেবায়, সেই বৎসের যত্নে তাঁহার দিন কত কাজে অনবকাশ হইয়া পড়িত। যখন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার ধবলী শ্যামলী বৎসগণসঙ্গে তাঁহার চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আঘ্রাণ করিত, তাঁহার গা চাটিত, তাঁহার হাতের খাদ্য কাড়িয়া কাড়িয়া খাইত, তখন তাঁহার প্রেম-পুলকিত হাস্যচ্ছটা-প্রভাসিত মহামহিমময়ী মূর্ত্তিটী দেখিলে, স্বয়ং ভগবতী-ভ্রমে হৃদয়ের ভক্তিরাশি যেন তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িত। বামা গরু পোষিতেন, কিন্তু পরের ছেলের দুধের দরকার না হইলে, পড়শীর বাড়ী রোগীর পথ্যের প্রয়োজন না হইলে বা কাহারও বাড়ীতে কুটুম্ব না আসিলে, গাভী বড় কখনও দোহন করিতেন না। ইষ্ট-সেবার দুধটুকু বৎসের দুগ্ধপানকালে তাহার কাছ থেকে চাহিয়া বলিয়া কহিয়া ভিক্ষা লইতেন!

সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানের পর রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বামা দেবীর কাজে অবসর ছিল না। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে বামাদেবী তাহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন না; কোনও প্রসূতি সন্তান প্রসব করিলে, অন্ততঃ দিবসে একবার গিয়া বামাঠাকুরাণী মাতা ও শিশুর তত্ত্ব লইয়া আসিতেন; মাতাকে নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশ দিয়া আসিতেন; অবাধ্য প্রসূতিকে গালি পাড়িয়া বশে আনিতেন। কোনও বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম পার্ব্বণ উপস্থিত হইলে পাঁচ দিন পূর্ব্বে বামাদেবী যাইয়া সে বাড়ী হাড়ি কাঠি ধরিতেন! ছোট খাট নিমন্ত্রণের জিনিষপত্রের হিসাব বামাদেবী মুখে মুখে বলিয়া দিতেন। বামাদেবীর হাতে না হইলে কাহারও ছেলে মেয়ের বিবাহের পিড়ী চিত্রিত হইত না। বামাদেবীর হাতের পৈতা না

হইলে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের উপবীত হইত না, সৌখীন ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি হইত না।

বামাঠাকুরাণীকে লোকে ভক্তি করিত, ভয়ও করিত। বামা দেবীর স্বভাব ছিল তিনি নিজে কাহাকেও ভয় করিতেন না; কাহারও কিছু অন্যায় দেখিলে, তিনি ছোটই হউন আর বড়ই হউন বামা তাঁহার সম্মুখেই দুকথা শুনাইয়া দিতেন।

যাঁহার কথা এত বলিলাম, তাঁহার রূপের কথাও বলিতে হয়। বামাদেবী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী; তাঁহার দেহের গঠন খুব বড় ছাঁচের; কিন্তু সর্ব্বাংশেই মানানসহি, তাহার বয়স এই পঞ্চাশ বৎসর বা তাহার কিছু কাছাকাছি! কিন্তু তাঁহাকে কেহ বৃদ্ধ বলিতে পারিত না। সেই পূর্ণায়তন চিরস্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধলাবণ্যময় সুগোল মাংসল দেহে বার্দ্ধক্যজরার চিহ্নমাত্রও পড়ে নাই;—সে আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য কঠোর সদাশ্রমরত সৌষ্ঠব-যত্ন-বিহীন দেহখানি সুনিপুণ ভাস্কর-চিত্রিত দেবী-প্রতিমাবৎ এখনও সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়! সে করুণা-কোমল মুখমণ্ডল এখনও সরসহাস্যোদ্দীপ্ত, মহিমার আধার! কেবল নাই তাহাতে চাঞ্চল্য,—নাই তাহাতে শোক দুঃখের বিকারচ্ছায়া।

এক্ষণে জিজ্ঞাসিতে পারেন, বামাদেবীর ভরণ পোষণ চলিত কিরূপে? বামাদেবী পৈতা তুলিতেন, কাঁথা সেলাই করিতেন, তাহার বিক্রয়ে বেশ পয়সা হইত। খাইয়া বিলাইয়া বাগানের ফল বা শাক শব্জী যাহা থাকিত তাহাতেও দু পয়সা হইত। গ্রামের অনেকের বাড়ী হইতে পূজার সময় বামাঠাকুরাণীর বার্ষিক একখানা বা এক যোড়া কাপড় আসিত। ব্রাহ্মণ বিধবার খরচ কি? বামাঠাকুরাণীর দুই এক টাকা বাঁচিত; তাহাদ্বারা তিনি ব্রত নিয়ম করিতেন, গরীব দুঃখীদিগের

নিকট তেজারতী করিতেন। সুদ পাইতেন কি আসল পাইতেন তাহার খবর কেহ বলিতে পারে না।

বামাদেবী আর একটী বড় সমাজ বিগর্হিত কাজ করিতেন। তাঁহার পিতার ঘরের শালগ্রাম ঠাকুরের পূজা তিনি নিজেই করিতেন। স্ত্রীলোকের নারায়ণ পূজায় অধিকার নাই বলিয়া গ্রামের দশজন তাঁহাকে তিরস্কার করিত। তিনি বলিতেন আমার ঠাকুরের পূজা আমি করিব, ইহাতে অনধিকার অধিকার বুঝি না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বামাদেবী আসিলেন; কমলা বসিতে আসন দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মায়ের আদেশক্রমে খোকা খুকীরাও প্রণাম করিল। বামা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, খোকাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। অন্যান্য দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "বউ তোমার কথায় নাকি দেবেন্দ্র চাকরী ছেড়ে দিয়েছে?"

কমলা বড় লজ্জিত হইলেন; একথা দেবেন্দ্রনাথ সকলের কাছে বলিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার উপর রাগ হইল। একটু অপ্রতিভের ন্যায় কমলা বলিলেন, "আমারই কথায় ছাড়েন নাই। আমি ছাড়্‌তে বলেছিলাম, তাঁরও ইচ্ছা ছিল, তাই ছেড়েছেন।"

বামা। তুমি চাকরী ছাড়্‌তে বল্লে কেন? চাকরী থাক্‌লে কত সোণা মণি পর্‌তে পেতে?

কমলা। স্বামী যদি পরের সেবায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন, তবে আমরা ঘরে ব'সে সোণা মণি পরে কার সেবা কর্‌বো? এবার সোণা মণি ছেড়ে, সর্ব্বদা কাছে কাছে রেখে স্বামী সেবা কর্‌বো মনে করেছি।

বামা। দেশ গাঁ ছেড়ে, সহরে বাসা করে, সমস্ত বছরই স্বামীর সঙ্গে থাক, তবুও স্বামী সেবার সাধ মিট্‌লো না?

কমলা। সেকি আর স্বামীর সেবা? সেত স্বামীর সেবা করা নয়, স্বামীর সেবা পাওয়া। স্বামী সেই দশটা হইতে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে

প্রভুর সেবা করে অর্থ উপার্জ্জন কর্‌বেন, আর আমি সেই অর্থে সোণা মণি অলঙ্কারে সেজে পথপানে চেয়ে থাক্‌ব, তাতে কি সেবা করা হয়? এভাবে যে সময় স্বামীর সাক্ষাৎ পাই, সে সময় কি সেবা করি,—না স্বামীকে ভোগ করি। তখন স্বামীকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করি, বালিকার মত যেন খেলার জিনিষ নিয়ে খেলা করি। এতে কি মা স্বামীর সেবা হয়?

বামা। তোমার মতে কি তবে, স্বামীকে সর্ব্ব কর্ম্ম হতে টেনে এনে বুকের ভিতর ননীর পুতুল সাজিয়ে রাখাই স্বামী সেবা?

কমলা। আমি বল্‌ছি, আমি স্বামীকে ভোগ কর্ত্তে চাই না, স্বামীর সেবা কর্ত্তে চাই। তিনি আমাকে এতকাল ভাতকাপড়ে সেবা কল্লেন, আমি না হয় তাঁকে কিছু কাল সেবা করি।

বামাদেবী হাসিলেন, বলিলেন, "খুব স্বামী পাগলিনী বটে! কিন্তু এই কি কখনও হয়? পুরুষ কর্ম্মের জীব, তাহাদিগকে কর্ম্ম হতে সরিয়ে আন্‌লে যে তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত,—কাজেই ধর্ম্মচ্যুত করা হয়। স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ জন্য পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে।

কমলা। কিন্তু আমার যিনি দেবতা, তাঁকে অপরে পদসেবক ভৃত্য ভেবে অনাদর কর্‌বে, আমি তা কি করে সহ্য কর্‌বো?

এবার কমলা দেবেন্দ্রনাথের চাকরী ত্যাগের সমস্ত ঘটনা যথাযথ বামা দেবীর কাছে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া বামাদেবী সন্তুষ্ট হইলেন; কমলাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন। পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "কমল, স্বামীকে দেবতা ভাবিয়া, হিন্দু-রমণীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিয়াছ, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের পথ রোধ করা যে ভাল হয়েছে, সেটা আমি বুঝ্‌তে পারি না। উপার্জ্জন না থাক্‌লে কি করে তোমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে?

কমলা। যারা চাকরী করে না, তাদেরও ত দিন চলে যাচ্ছে! গ্রামের সকলেই কি চাকরী করে? যারা চাকরী করে না, তারাও ত খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

বামা। না মা, নিষ্কর্ম্মা থেকে কারই অন্ন বস্ত্র চল্‌তে পারে না। দেশে এমন দিন এক সময় ছিল, যখন অল্প পরিশ্রমে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হত। এখন আর তেমন দিন নাই। ঐ দেখ্‌ছ, যারা চাকরী করে না, তারা আপনার ঘরে চাকরীর চেয়ে অনেক খাটে। যারা তা খাটে না, তারা অতি নিকৃষ্ট, পরের অনুগ্রহে পরের গলগ্রহ হয়ে দিন কাটায়।

কমলা। আমরাও এখন নিজের খাট্‌নি খেটে ভাত কাপড় যোগাড় কর্‌বো। পরের দাসত্ব চেয়ে ভাল।

বামা। ভাল বটে, কিন্তু পার্‌বে কি? শরীরে কুলাবে কি?

কমলা। আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে নিলে অবশ্য কুলাবে! আমার নরেনের বেশ সুস্থ সবল দেহ; তাকে আমি এখন থেকেই পরিশ্রম কর্ত্তে শিখাব।

বামা। হ্যাঁ! ইচ্ছা থাক্‌লে দিন চল্‌তে পারে, কিন্তু বড়ই গরীবের মতন চলবে।

কমলা। গরীবের মতন দুসন্ধ্যা দুটী শাক ভাত জুটলেই হ'ল, আবার কি?

বামা। না বউ, মানুষের ধর্ম্ম এমন নয়, শুধু কোনওরূপে নিজের উদর পূরণ করাই ত ধর্ম্ম নয়। যার শক্তি আছে, তাকে অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তেই হবে। উপার্জ্জিত অর্থে আপনার চালিয়ে পরকে চালাতে হবে। যার নাই, তাকে দিতে হবে। শুধু আপনার অভাব পূরণ করে নিশ্চিন্ত থেকে, শক্তি ও সময় অনর্থক নষ্ট করা ভগবানের ইচ্ছা নয়। যার দশ

টাকা উপার্জ্জনের শক্তি আছে, তার দু টাকা উপার্জ্জন করে তৃপ্ত থাকা ভাল নয়।

কমলা। এইত ত্রিশ টাকা হতে দেড়শ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন, করা হয়েছে; কিন্তু কই আমাদের সে অর্থে কয়জন অন্নহীনের অন্নসংস্থান হয়েছে? বা কয়টী টাকা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রয়েছে? সকলই আমাদের অনর্থক বিলাস সুখেই উড়ে গিয়েছে। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতা বাড়ে মাত্র।

বামা ঠাকুরাণী ও কমলাতে এরূপ অনেক কথা হইল। কিন্তু বামা ঠাকুরাণী প্রমাণ করিতে পারিলেন না যে, দেবেন্দ্রনাথের চাকরী ত্যাগ করিয়া আসা মন্দ হইয়াছে; অথচ এটা যে ভাল হইয়াছে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "আমি আমার গুরুদেব আসিলে, তাঁর কাছে এ বিষয়ের মীমাংসা ক'রে তোমায় বল্‌ব।"

কমলা। তোমার গুরুদেব কে?

বামা। সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারী! তাঁকে জান না?

কমলা। ঐ যে সন্ন্যাসী আমার ঠাকুরের কাছে আস্‌তেন? সে যে কত কালের কথা? তিনি এখনও আছেন?

বামা। তিনি ঠিক্ তেমনই আছেন; শুনেছি বয়স এক শ' ছাড়িয়েছে! তিনি এবার আস্‌লে আমি তাঁকে তোমায় দেখাব। তোমার কথা ব'ল্লে তিনি নিজেই এসে তোমায় দেখা দিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

বাড়ীতে আসিয়া কমলার বড়ই কাজের ভিড় পড়িয়া গেল। দীর্ঘ কালের পরিত্যক্ত বাড়ী নিতান্ত জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে। গৃহ ময়লা ধরিয়া, মাকড়সায় জাল পাতিয়া, দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্র-নাথের চালাঘরের বাড়ী; অনেক স্থানে ছাওনি খসিয়া গিয়াছে, দাওয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বেড়া বা দেওয়াল টুটিয়া পড়িয়াছে। কমলা অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া ঘরগুলি পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সঙ্গে সাহায্যার্থ পুত্র কন্যাকে লইলেন। কমলা বহুদিন কলিকাতার বাসায় থাকিয়া, পরিশ্রমে নিতান্ত অনভ্যস্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন, বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কমলা কাজ জানিতেন, বাল্যে পিতৃগৃহে ও যৌবনেরও কতক কাল শ্বশুরগৃহে—পল্লীগ্রামের গৃহস্থের ঘরে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আজ স্বতঃই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তিনি স্বামীকে যে অবস্থায় আনিয়াছেন, তাতে এরূপ পরিশ্রম, নিতান্ত আবশ্যক। আরও বুঝিয়াছেন প্রবাসে পরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, দাস দাসী লইয়া, ঘৃত দুগ্ধ মাংস পোলাও খাইয়া, গ্যাসের আলোকে বৈদ্যুতিক পাখায় বাতাস খাইয়া যে বাস, তাহা কারাবাস অপেক্ষা সুখের কিসে? দরিদ্র ব্যক্তি পরের বহুমূল্য পরিচ্ছদ

ধার করিয়া সাজিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ী গেলে তাহার যেমন সর্ব্ববিষয়ে সঙ্কোচ বোধ হয়,—কখন জানি পরের জিনিসের কোনওরূপ অনিষ্ট হয়, পর-গৃহ-বাসও তত্তুল্য কষ্টকর। যে গৃহের ক্ষুদ্র একটি বালুকা কণার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই; যাহাকে আমার ইচ্ছামত বাসোপযোগী করিবার জন্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিতেও আমার অধিকার নাই, সে গৃহে বাস করিয়া কি গৃহবাসের সুখ হইতে পারে? ঐ যে সেবার আমাদিগের বাসার পাশের বাড়ীতে ছেলেটী প্লেগে মারা গেল; বাড়ীওয়ালা তৎক্ষণাৎ পুত্র-শোকাতুরা মাতা পিতাকে মড়া পুত্র লইয়া রাস্তার বাহির করিয়া দিল; এইত পরগৃহ-বাসের আনন্দ! এই যে আমার স্বগৃহ,—সামান্য চালাঘর, ইহার সবটুকু আমার। আমার সুবিধার জন্য ইহাকে ভাঙ্গা গড়ার সম্পূর্ণ অধিকার আমার! আমার গৃহের পার্শ্বে কত নটে শাক, থানকুড়ি, আমরুলি শাক,—যাহা আমার স্বামী পুত্র বড় ভাল বাসেন, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আমার। একবার বাসার একটি পেয়ারা গাছ থেকে নরেন একটি পেয়ারা তুলিয়াছিল, বাড়ীওয়ালা কত কর্কশ ভাষায় আমাদিগকে তর্জ্জন করিয়াছিল! এখানকার সমস্ত গাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিলে আমায় কে কি বলিতে পারে? ঐ যে বাগানে কলা গাছগুলি কেমন সুস্থ দেহে পাতা দোলাইয়া রৌদ্রে চিক্ চিক্ করিয়া হাসিতেছে, কেহ ফল ভারে অবনত, কাহারও কেবল মোচা জাগিয়াছে;—সমস্তই নির্ব্বিরোধে আমারই সেবার উপকরণ যোগাইতেছে। ঐ যে আমার শ্বশুরের আমলের আম কাঁটাল কুল পেয়ারার গাছগুলি যত্নাভাবে বুনো হইয়া গিয়াছে, তবু তাহাতে কত ফল ধরিয়াছে; আমার নরেন, আমার ফুলরাণীর এতে সম্পূর্ণ অধিকার।—কেউ কি তাহার রোধ করিতে পারে? আমার শ্বশুরের বাগানে এখনও কত

জবা, করবী, চাঁপা, মল্লিকা ফুল ফোটে! মায়ের পুজার ফুলের জন্য ত আর ফুলওয়ালার যোগান লইতে হয় না! এ সবত আমার নিজের, —পাড়াপড়শীর বাগানের ফুল ফল নিমপাতা সজিনার ডাঁটার উপরও আমার অধিকার আছে। এই গ্রামের শক্রজনের বাড়ীতেও আমার যেটুকু অধিকার, সহরে সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আমার ততটুকু অধিকারও ছিল না। কমলা অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্তা, কিন্তু মুক্ত বায়ুতে মুক্তপ্রাণে এই সকল চিন্তায় সে পরিশ্রমের উত্তাপ লঘু করিয়াছিল। পরিশ্রমে যদি দাসত্বের অঙ্কুশ বা অভিমানের গরলাশঙ্কা না থাকে তবে তাহার শ্রান্তিতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় না। কমলার আরও এক সুখের চিন্তা আছে,—তাঁহার স্বামী আজ স্বচ্ছন্দে স্বাধীন চিত্তে, আফিসের সময়াপেক্ষায় ঘড়ির দিকে না চাহিয়া, বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত আলাপ করিতেছেন। আনন্দের সহিত কমলা অনেক কাজ করিলেন। ঘর উঠান পুকুরঘাট পর্য্যন্ত ঝাট্ দিয়া ফুল ফুল করিলেন; খাট তক্তপোস তৈজস পত্র সমস্তই পরিস্কার করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথও ঘরামি ডাকিয়া ঘর মেরামত করিলেন, বাগান পরিষ্কার করিলেন, পুকুরের শেওলা তুলিয়া ফেলিলেন। পুত্র কলত্র সেবায় বৃদ্ধা জননীর স্নেহের কোলে মুক্তপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথের দিন বেশ সুখে চলিতে লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথের পৈত্রিক কিছু ভূসম্পত্তি ছিল; গ্রামের মধ্যেই তাঁহার কয়েক ঘর প্রজা। কিন্তু সকলের অবস্থাই অতি হীন; দু'সন্ধ্যা স্বচ্ছন্দে কাহারও পেটে অন্ন জুটে না। অনেকেরই তিন চারি বৎসরের খাজনা বাকি। মনিব দূরে থাকিতেন, অন্তঃকরণও ভাল, কড়া তাগিদ করিতেন না। মনিবের দায় চেয়ে প্রজারা আজ কাল মহাজনের দায়েই বিব্রত। ক্ষেত্রে ফসল হয়, কিন্তু গোলায় থাকে না,

মহাজনের দায়ে উড়িয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে ডাকাইলেন; মনিব খাজনার তাগিদ করিবেন, দিতে পারিবে না; সুতরাং অপমান ভয়ে অনেকেই প্রথম দিন আসিল না। দুই এক জন প্রবীন বাগানের দুই একটা ফল তরকারী, বা অবস্থা বিশেষে একটী টাকা বা আধুলি লইয়া মনিবের সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহাদের বৃদ্ধ মনিব মারা যাইবার পর অনেক দিন তাহারা আর মনিব বাড়ী আসে না, মনিবের দ্বারে আপনাদের বিবাদ বিসম্বাদ সুখ দুঃখের কথা জানায় না, মনিব বাড়ীর প্রসাদ পায় না। কর্ত্তা বড় দয়ালু ছিলেন, বড় বুদ্ধিমানও ছিলেন, তাঁহার জন্য প্রজারা দুঃখ প্রকাশ করিল।

দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে শুনিলেন প্রজাদিগের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, আর তাহারা স্বাধীনভাবে মনের মত করিয়া ক্ষেত্রের চাষ আবাদ করিতে পারে না। তাহাদের ভাল বলদ নাই, টাকা নাই যে কিনিয়া লয়, পরের বলদ ভাড়া বা "পালো" রাখিয়া মরসুমের চাষ করে, এক মরসুমে একটী ভাল বলদের মূল্যের মতন ধান একটী বলদের জন্য দিতে হয়। এইরূপে মহাজনের সুদ প্রভৃতি দিয়া যে দুই চারিটী থাকে তাহাদ্বারাই তাহাদের সমস্ত চালাইতে হয়; সুতরাং বৈশাখের পূর্ব্বেই তাহাদের খাবার ফুরাইয়া যায়। যাহারা দুইজন পুরুষ এক পরিবারে থাকে, তাহারা একজন নিজের মাঠে চাষ করে, অন্য জন পরের ক্ষেত্রে খাটিয়া পরিবারের খাবার যোগায়, কাজেই খামারের জমি পতিত থাকে; যাহা আবাদ হয় তাহাও রীতিমত হয় না। আর যে ব্যক্তি একক, সে মহাজনের বাড়ী হইতে দ্বিগুণ সুদে ধান ধার করিয়া আধ পেটা খাইয়া মাঠে কাজ করে। সুতরাং পর বৎসরেও তা'দের সেই অবস্থা!

দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত বুঝিলেন। কমলার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে আমাদের অন্ন চলিবার পথ নাই। কলিকাতায় তৈজস পত্র অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া দেবেন্দ্রনাথ কিছু টাকা সংস্থান করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহাদ্বারা প্রজাদিগকে সাহায্য করিবেন স্থির হইল। অবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে প্রজাদিগকে ডাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ টাকা ধার দিলেন। টাকার স্থদ অল্প, প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া চারি বৎসরে টাকা শোধ দিবার ব্যবস্থা রহিল। ইহার মধ্যে নিজেরও একটুকু স্থবিধা করিয়া লইলেন। প্রত্যেকে অবস্থানুসারে এক বিঘা বা আধ বিঘা জমির উৎপন্ন শস্তের তৃতীয়াংশ মনিব দেবেন্দ্রনাথকে দিবে; মনিব উক্ত জমির খাজনা রেহাই দিবেন; প্রজারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতে সম্মত হইল। আবার বহুকাল পরে কৃষকেরা আহ্লাদে বলদ কিনিতে ছুটিল! স্থদখোর মহাজনেরা ভ্রুভঙ্গি করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের খ্যাতি গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল; উপকৃত প্রজাদিগের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা পাইয়া দেবেন্দ্রনাথের সংসার ভারও লঘু হইয়া চলিল। প্রজাদিগের মেয়েছেলেরা প্রায়ই মনিব বাড়ী মা ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে আসিত। কেহ তরকারী, কেহ বেল, আতা আনারস, শসা পেয়ারা প্রভৃতি ফল রাখিয়া বুড়া ঠাকুরাণী ও বউ ঠাকুরাণীর পায়ে প্রণাম করিত। যেই আসিত সেই কমলার উদার হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহে বাঁধা পড়িত। কমলার প্রাণময় প্রীতির আকর্ষণে সেই সরল কৃষক-ললনা-দিগের হৃদয় আঁকড়িয়া ধরিল। এখন আর কৃষক বালকেরা মাছ ধরিয়া মনিব-বাড়ী না দিয়া খাইতে চায় না। গাইএর দুধ মনিবের ছেলে মেয়েকে মাঝে মাঝে না দিলে গাভীর অমঙ্গল হইতে পারে, এই ভাব প্রজাদিগের মনে স্বতঃই আসিয়া উদিত হইল। মনিব-গৃহিণী দুই

খাইতে ভালবাসেন শুনিয়া দশ জনে দশ রকমে নির্জ্জল দুধের দই আনিয়া কমলার দ্বারে খাড়া হইত। এতটায় কমলা বড় লজ্জিত হইতেন। গরীব প্রজারা তাহাদের ছেলে মেয়ের মুখের কাড়িয়া এমন ভাল দুধ দই নিয়ে আসে, এতটা কমলার মনে ভাল লাগিত না। তিনি নিষেধ করিতেন। প্রজারা বলিত, "মা, আমরা তোমারই খাই ; মনিব-বাড়ী না দিয়ে খেলে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে ?"

শুনিয়া কমলার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত! স্বগৃহে স্বজনমধ্যে স্বাধীন ভাবে বাস করিতে কি এত আনন্দ! এ সুখ কি গরীবের সুখ?—ধিক্ এর কাছে দাসত্বের সোণা মণি!!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০*০*০—

দিবসের কার্য্যান্তে দেবেন্দ্রনাথ পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে লইয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একমাস ত বসিয়া বসিয়া স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল! ভরসার মধ্যে কেবল এবারকার আবাদের ফসল, কিন্তু এমন ভাবে কি দিন কাটিবে?"

কমলা বলিলেন, "আমার বিশ্বাস দেখিয়া শুনিয়া চলিলে, দিন অবশ্যই চলিবে। এই দেখ তোমার এক মাসের খরচের হিসাব!" কমলা বাসায় জমা খরচ লিখিতেন, বাড়ীতে লিখিতে ভুলেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এত কম খরচে চলিয়াছে?"

কমলা। কেন চলিবে না? একে একে দেখে যাও। এ মাসে মাছ কিনিতে তিন টাকা লাগিয়াছে, কলিকাতায় ২০৲ টাকা লাগিত। তরকারী কিনিতে এক টাকা মাত্র লাগিয়াছে, বাসায় ১৫৲ টাকায় কুলাইত না। ইহার পরে বাড়ীতে প্রস্তুত করিতে পারিলেই কিছুই লাগিবে না। আমি বাড়ীতে এসেই যে কুমড়া গাছগুলি পুঁতেছি সেগুলি কেমন সুন্দর হয়েছে দেখেছ? বেগুনের চারা গজাইয়াছে! যা'ক; তার পর ৪৲ টাকার দুধ কেনা হইয়াছে, বাসায় ২৫৲ টাকা

খরচ করিয়া এমন মিষ্টি দুধ খেতে পেতে? এখানে বিনা ব্যয়ে গরু পোষা যায়, একটা গরু কেন, দুধের পয়সা থেকে যাবে। বাসায় মাসে পাঁচ টাকার কম ধোপার ব্যয় কুলা'ত না, এ মাসে এক টাকা লাগে নাই। এখন ত হ্যাট কোট ধোয়াতে হয় না। এক পয়সায় কাপড় ধুলে চলে; দু'আনা চারি আনার ধোপা মিলে না। এখানে গাড়ি ভাড়া নাই, আতর গোলাপের ব্যয় নাই। খোকা খুকীদের খাবারের জন্য কত লাগিত! এ মাসে একরূপ কিছুই লাগে নাই! বাগানের ফল, আর চিঁড়া মুড়িতেই চলে গেছে। চাউলের দাম কলিকাতায় ৬৲ টাকা, এখানে চার টাকা; একটু মোটা চাউল খাইলে ৩৲ টাকায় মিলে! তার উপর সেই সর্ব্বনেশে বাড়ী ভাড়া মাসিক ৪০৲ টাকা। মোটের উপর পর মাসে এর চেয়ে আরও কম খরচ লাগিবে।

দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, চাকরীতে মাসে দেড় শত টাকা আয় করিতেন, দেড় শত টাকাই ব্যয় করিতেন। বাড়ীতে ২৫৲ টাকা ব্যয়ে সংসার চলিতে পারে, সুতরাং, সে দেড় শত টাকা আয় এখনকার ২৫৲ টাকা আয়েরই সমান হইতে পারে। কিন্তু কমলা এতটা বুঝিল কিরূপে? আমি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কমলা যাহার গৃহিণী তাহার দিন সুখেই চলিবে। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "নরেনের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শীঘ্রই তার পরীক্ষার ফল বাহির হইবে; মাসে ২০৲ টাকার কমত তার কলেজে পড়া চলিবে না।"

কমলা। আর পড়্‌বে কি? আমি আমার কাউকে চাকরী কর্ত্তে দিচ্ছি না; তবে কলেজে পড়ার দরকার?

দেবেন্দ্রনাথ হাসিলেন, বলিলেন "এইবার তোমার স্ত্রীবুদ্ধি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। লেখাপড়ার উদ্দেশ্যই কি চাকরী?"

কমলা। তা বই আর কি?

দেবেন্দ্র। লেখাপড়া চাকরীর জন্য নয়, জ্ঞানের বিকাশের জন্য। লেখাপড়া না শিখ্‌লে মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না। বিদ্যার অভাবে অসীম ঐশ্বর্য্যেও লোক সুখী হ'তে পারে না।

এমন সময়ে বাহিরে শব্দ হইল, "জয় জগদীশ্বর! বাবাজি, আমি সিদ্ধেশ্বর ঠাকুর।"

অতি ব্যস্তে দ্বার খুলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। কমলাও মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সন্ন্যাসীর পদে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রহ্মচারী আসন পরিগ্রহ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অতি স্নিগ্ধ, হৃদয়স্পর্শী, মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মচারী কহিলেন, "বউ মা! আমি সন্তান, আমায় লজ্জা করিতেছ কেন? আমি তোমাকে দেখিতেই আসিয়াছি। বামার কাছে শুনিলাম, তুমি আমায় দেখিতে চাহিয়াছ।"

কমলা সলজ্জে ব্রহ্মচারীর দিকে চাহিলেন, দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অনুমতি হইলে আমি স্থানান্তরে যাই, আপনার কন্যা বড় লজ্জাশীলা।"

ব্রহ্মচারীর ঈঙ্গিতে দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন। কমলা ঠাকুরের কাছে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার পায়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসিলেন, "মা! তুমি তোমার স্বামীকে সাহেবের চাকরী হইতে সরাইয়া আনিয়াছ?"

কমলা কোনও কথা বলিলেন না। ব্রহ্মচারী আবার বলিলেন, "চাকরী তোমার কাছে কি বড় ঘৃণার কাজ?

কমলা। দাসত্ব ঘৃণার ভিন্ন আদরের বলিয়া আমার আর বিশ্বাস নাই।

ব্রহ্মচারী। সম্পদ্‌হীন বঙ্গবাসীর চাকরী ভিন্ন যে অন্নসংস্থান হইতে পারে না।

কমলা। আমি তাই জানিবার জন্যই আপনার দর্শন ভিক্ষা করিয়াছিলাম; আপনি বলুন আমাদের অন্নসংস্থানের উপায় কি?

ব্রহ্মচারী। তাই বল্‌ব বলেই এসেছি মা! শুন; "চাকরী" সকল ক্ষেত্রেই ঘৃণিত নয়। চাকরীই জগতের কাজ, চাকরী জগতের বিনিময়ের বস্তু। আমরা টাকা মোহর লইয়া সংসারে আসি নাই; শুধু এই দেহ লইয়াই আসিয়াছি। এই দৈহিক শক্তি বিনিময়েই আমাদের দেহ রক্ষা কর্ত্তে হবে। দেহের শক্তিদ্বারা অপরের সাহায্য করিয়া মূল্য গ্রহণ করা হেয় নয়। তোমার স্বামী সাহেবের কার্য্যে সহায়তা করিতেন,—সাহেবের তাহা প্রয়োজন, তাহার বিনিময়ে সাহেব তাঁহাকে মূল্য দিতেন। তাহা ঘৃণার হইতে পারে না। যিনি মহারাজ, যিনি লাট সাহেব, তিনিও চাকর। রাজা প্রজার চাকর; তিনি রাজ্য রক্ষা করেন, তাই প্রজারা তাঁহাকে কর বা মূল্য দেয়।

কমলা। কিন্তু সাহেবেরা বাঙ্গালী বাবুকে ক্রীতদাস অপেক্ষা ঘৃণিত মনে করে।

ব্রহ্ম। হ্যাঁ, সেই কথাই বলিতেছি! চাকরীর এখন সে গৌরব নাই; ঘৃণিত দাসত্বেই পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে চাকরীর নাম ছিল কাজ, তা'তে দাসত্ব আসিত না। লোকে চাকরী করি বলিতে ঘৃণা করিত, বলিত কাজ করি। তখন চাকরীর নাম ছিল মন্ত্রিত্ব, সারথ্য, শাসনকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি। তার পর মুসলমান রাজাদের আমলেও নাএব, গোমস্তা, ফউজদার, মুহুরী, হিসাব-নবীস প্রভৃতি সম্মানার্হ পদের উল্লেখ হইত। এখন সমস্ত গিয়া "চাকরীই" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক এখনকার চাকরী দাসত্বই বটে। যাঁহার কাজ করিতে হইবে, তিনি কর্ম্মচারীর সুখ দুঃখ দেখেন না, সুবিধা অসুবিধা বোঝেন না। কর্ম্মচারীর দ্বারা তিনি যে কিছু পাইতেছেন, তাহা মনে করেন না; মনে করেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কর্ম্মচারীর জীবিকা সংস্থান করিয়া দিতেছেন। কর্ম্মচারীর প্রতি প্রভু নিতান্ত

গর্ব্বের চক্ষেই চান, তার সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিতে তাঁর অভিমান বোধ হয়। পক্ষান্তরে কর্ম্মচারীও কর্ম্মকর্ত্তার সুখ সুবিধা চায় না; নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত একদিন একটুকু সামান্য পরিশ্রমে কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষ লাভ জানিয়াও তাহাতে কুণ্ঠিত হন। আপনাকে নিতান্ত দাস ভাবিয়া আত্মসম্মান অত্যন্ত হীন করিয়া ফেলেন।"

"বর্ত্তমান বঙ্গীয় ভদ্রলোকগণ চাকরীজীবি হইয়া তাঁহাদের মানসিক স্বাধীনতা একবারেই হারাইয়াছেন। বিদেশী প্রভুর অনুকরণে, তাঁহাদের অশন, বসন, ভ্রমণ, চিন্তন সকলই পরাধীন। দুগ্ধ ফেলিয়া সুরা তাঁহাদের পানীয়, পরিপাকে অসমর্থ তবুও শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যে তাহাদের রুচি। অভাবে ব্যতিব্যস্ত, তবুও বহুমূল্য বৈদেশিক বেশ ভূষায় তাহাদের রুগ্ন শরীর সমাচ্ছন্ন! আগেকার লোকে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে পরিবার প্রতিপালন হইত। অতিথি অভ্যাগত দুঃখিত পীড়িতের সেবা হইত, জলকষ্ট পথকষ্ট নিবারণে পূণ্য সঞ্চয় হইত; ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চিতও থাকিত! এখন আর তাহা নাই। এখন মাসিক সহস্র মুদ্রা যিনি উপায় করিতেছেন, তাঁহার জীবনান্তে দেখা যায় দেনায় তাঁহার বাস্ত ভিটা আবদ্ধ। সমস্তই ঐ সিন্ধু পারবর্ত্তিনী মায়াবিনী বিলাসিতা রাক্ষসী উদরসাৎ করিয়া ফেলে; বাঙ্গালী দাসত্বের বাজারে শোণিত বিকাইয়া ফেলে, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই গৃহে আনে না। ইন্দ্রিয়পর ব্যবসায়ীর ন্যায়, জীবন-ব্যবসায়ের লাভ মূল সকলই খোয়াইয়া ফেলে। এই সময়ে মা, নারী শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন,—মাতা, পত্নী, সহোদরার স্নেহ-রসাভিষিক্ত কোমল অনুরোধ অনুশাসন ভিন্ন বিপথগামী জাতীয়তাভ্রষ্ট বঙ্গ-পুরুষগণের ভ্রম কিছুতেই দূর হইবে না। মা! বঙ্গসংসারে নারীর অধিকার অক্ষুণ্ণ; কিন্তু বর্ত্তমানে রমণীরা তাহা হারাইতে বসিয়াছেন। আপাতমধুর বিলাসিতার দাসী

হইয়া বঙ্গগৃহিণীগণ অবহেলায় তাঁহাদের রাণীগিরি ভুলিয়া ছোট হইয়া পড়িতেছে। সকল সমাজেই পুরুষ নারীর মুখ চাহিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। পুরুষ যদি পাষাণ অপেক্ষাও কঠোর হয়, অগ্নি অপেক্ষাও অজেয় হয়, তবু নারী শক্তির কাছে তাহার অবনতি স্বীকার করিতেই হইবে। মহামতি রামচন্দ্র কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া অশ্বমেধ সম্পন্ন করিতে বাসনা করিলেন। বল দেখি মা, কোন্ শক্তির জয় লাভ হইল? এখনকার গৃহলক্ষ্মীগণ ভুল বুঝিয়া বসিয়াছেন; তাঁহারা সেবাধর্ম্মের কোমল আকর্ষণে পুরুষ হৃদয় অধিকার করিতে আর অভিলাষিনী নন, বিলাস-সৌন্দর্য্যের উগ্র জ্যোতিতে পুরুষের হৃদয় মোহবিহ্বল করিতেই অভিলাষিনী! কিন্তু মোহের ধাঁধা নেশামাত্র; পুরুষের প্রাণ তাহাতে অভিভূত হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, উন্মত্ত হয়, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সর্ব্বস্ব স্বাধীনতা নারীপদে ডালি দেয়; কিন্তু মা, স্থায়ী বাঁধ তাহাতে পড়ে না। তাই নারীর উপর পুরুষের সন্দেহ ঘুচে না, পুরুষের উপর নারীর সন্দেহ ঘুচে না। যেখানে সর্ব্বস্ব লইবার বাসনা, সেখানে প্রেম বাসনার সীমা না পাইয়া অবশেষে ভাঙ্গিয়াই যায়। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণ যদি আবার তাঁদের মধুময়ী মাতৃ মূর্ত্তি লইয়া, লক্ষ্মীর পুষ্পডালা মাথায় ধরিয়া পুরুষের পাশে দাঁড়ান; আবার যদি তাঁহারা বলিতে শিখেন,—সোণা মণিতে আমাদের শোভা ফুটে না; এই দেখ লাল সাড়ী আর ললাটের সিন্দূরে আমরা কেমন সুন্দর হইয়াছি; তবে পুরুষের মোহ ভাঙ্গিবে, আবার মহামহিমময়ী শক্তিরূপিণী নারীর মুখ পানে চাহিয়া পুরুষ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সাহসে নামিতে পারিবে। নারীজাতি যদি জানিতে চেষ্টা করেন, পুরুষেরা তাঁহাদের প্রিয়তমার বিলাসের সাজসজ্জা কোন্ ঘৃণিত নরকের নিম্নতম আঁধার হইতে আহরণ করেন, কোন পৈশাচিক শক্তির কাছে

আপনাদের শক্তি স্বাধীনতা বিকাইয়া সোণামণি গন্ধসার আহরণ করেন, তবে নিশ্চয়ই রমণীগণের যে বিলাসবৈভবে গ্লানি জন্মিবে! আর্য্য-কুল-লক্ষ্মীগণ যদি ম্লেচ্ছানুকৃত হ্যাট্-কোট্-ধারী গন্ধসার-চর্চ্চিত, সজ্জিত, মেদপিণ্ডমাত্র,—অন্তরে বাহিরে পরাধীন, বিকৃত, অকর্ম্মণ্য বাবুদিগের সেবায় বিতৃষ্ণ হইয়া, বিলাস-পরিশূন্য সুস্থ সবল কর্ম্মঠ জ্যোতির্ম্ময়-দেহ, আত্মসম্মানবোধশীল স্বাধীনচেতা আর্য্য পুরুষের সেবায় অভিলাষিনী হন, এজাতির অভ্যুত্থান আবার হইতে পারে। আর্য্য রমণীগণ যদি আবার পূর্ব্বস্মৃতি মনে তুলিয়া চিন্তা করেন, তাঁহারাই একদিন রণপরাজিত স্বামীর প্রবেশনিষেধার্থ পুরীর দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, দেশের গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহারা অলঙ্কার দূরের কথা, শিরঃ-শোভা কেশের ছেদন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য স্নেহের পুতলি সুকুমার কুমারকে সাংঘাতিক শত্রুমুখে প্রেরণ করিতে হৃদয় অবিচলিত রাখিতে পারিয়াছিলেন, স্বামী পুত্রের দুর্দ্দশার সময়ে, অনশন অর্দ্ধাশন, পথ পর্য্যটন, ভিক্ষা প্রভৃতিতে ক্লান্তি বোধ না করিয়া, পুরুষের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, তবে আশা করিতে পারি এ পতিত জাতির সুদিন আবার আসিতে পারে! আর্য্য-শক্তি, আর্য্য-তেজ, আর্য্য-পবিত্রতা এ ভারতে পুরুষ-সমাজে নাই; নারী-সমাজে নিভৃত আঁধারে সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাণোন্মুখ নিস্তেজ ভাবে এখনও রহিয়াছে, যদি নারীজাতি তাহা জ্বালায়, তবে আবার জ্বলিবে; নইলে ভারত যে "তিমিরে সে তিমিরে!"

ব্রহ্মচারীর উজ্জ্বল নয়ন যুগল যেন জ্বলিতেছিল; তাঁহার শ্বেত-শ্মশ্রুরাশি-সমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল কি এক অলৌকিক জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচারীর তেজোদ্দীপ্ত নয়ন প্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রুও ফুটিয়া উঠিল। কমলা মুগ্ধ হইলেন; তিনি বিহ্বলার ন্যায় ব্রহ্মচারীর

মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, "আমরা কি উপায়ে অন্ন সংস্থান করিব, দেবতার কাছে তাহাই উপদেশ চাই!"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হ্যাঁ! সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি; দেবেন্দ্রনাথকে কাজ করিতে হইবে। তাঁহার প্রকৃতি ফিরিয়াছে, ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির আয়ে তাঁহার মোটা মুটি চলিতে পারে, কিন্তু সমর্থ যুবক দেবেন্দ্র নাথের কর্ম্মহীন থাকা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ এখন আশা করা যায়, দেবেন্দ্রনাথ অর্থ উপার্জ্জন করিলে তদ্দ্বারা অনেক সাধু কার্য্য হইতে পারে, বিলাসিতার অনাবশ্যক অভাবে আর তাহার অর্থ ক্ষয় হইবে না। আমি চেষ্টা করিব যে কাজে উপার্জ্জন হয়, স্বাধীনতা খোয়াতে না হয়, এমন কাজ আমি চেষ্টা করিব। কিছু দিন তিনি বিশ্রাম করুন, তাঁহার বর্ত্তমানে গ্রহ সুপ্রসন্ন নয়।

কথাবার্ত্তার সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মাতা আসিয়া সেস্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "বাবাজি! আপনি আমার দেবেনের গ্রহ শান্তির জন্য একটু স্বস্ত্যয়ন্ করুন না?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্রনাথের গ্রহ অপ্রসন্ন হ'লেও লক্ষ্মী তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী, কুগ্রহের শক্তি তাহাতে পরাজিত হইবে। তবু আমি ভগবানের কাছে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।" বলিয়া ব্রহ্মচারী উঠিলেন। কমলা বলিলেন, "আবার কবে আসিবেন?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি দেশ ভ্রমণে যাইতেছি! তিন মাস ভ্রমণেই থাকিব, পরে তোমাদের দেখিতে আসিব।"

সকলের প্রণাম গ্রহণ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রবেশিকা পর্য্যন্ত ইংরেজী পড়িয়া বিশেষ শৈশবকাল হইতে পল্লী-গ্রামের সংস্কার ছাড়িয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী যোগী মানিত না। কিন্তু ব্রহ্মচারীর কথাবার্ত্তায় তাঁহার প্রতি হঠাৎ আজ নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ মাকে বলিলেন, "মা! এ ঠাকুরত বড় ভাল মানুষ। সন্ন্যাসীরা ত প্রায়ই ভণ্ড।"

কমলা। ছি! অমন কথা ব'ল না। ব্রহ্মচারী দেবতুল্য। আমরা অনেক দিন থেকে ওকে জানি; ওঁর জ্ঞানের সীমা নাই। কত রকম শাস্ত্র উনি জানেন। কত দেশে উনি বেড়ান। তোমরা যে ইংরেজী পড়ে এখন শাস্ত্র মান না; শুনেছি যে সে ইংরেজীতেও উনি পণ্ডিত লোক। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখ।

নরেন। উনিত বল্লেন, দেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন, তিন মাসের মধ্যে আস্‌বেন না।

কমলা। তিন মাস পরে আস্‌লে সাক্ষাৎ করিও।

নরেন। মা, আমার ইচ্ছা করে ওর সঙ্গে আমিও কিছু কাল দেশ ভ্রমণ করি।

কমলা। ওর সঙ্গে থাক্‌লে, ওর সঙ্গে বেড়ালে অনেক জ্ঞান লাভ হতে পারে,। আজ কাল ছেলেদের সাহেবের কাছে লেখা পড়া শিখতে না দিয়ে, এইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রেখে যদি শাস্ত্র শেখান যায়, তবে বড় ভাল হয়।

নরেন। তবে মা যথার্থই আমায় যেতে দাও না। আমার পরীক্ষার ফল বের হতে এখন দু মাস বিলম্ব, এ ক'দিন ওঁর কাছে থেকে নানা দেশ দেখব, আর ওঁর কাছে হিন্দুশাস্ত্র শিখব।

কমলা। ঠাকুর তোমাকে নিতে চাহিবেন কেন?

নরেন। আমি ভালরূপে বলে দেখি।

কমলা। তুমি কি ওঁর সঙ্গে যেতে পার্‌বে? উনি যে পায় হেটে দেশ বিদেশে বেড়ান। তুমি কি পথ চল্‌তে পার?

নরেন। আশী বছরের বুড় ব্রাহ্মণ যদি পারেন, তবে আমি পার্‌ব না? অবশ্য পার্‌ব মা। আমি প্রত্যহ দশ ক্রোশ পথ হাটতে পারি।

পুত্রের মুখের দিক চাহিয়া মাতার বিশ্বাস হইল; নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেশ ভ্রমণে যাইতে পারে। তাহার শরীর বেশ সুস্থ ও সবল। কমলা ভাবিলেন, ইহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। দেবতুল্য পরম জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভে, দেশ বিদেশ দেখিয়া মেধাবী বালক নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইবে সন্দেহ নাই। যদি পুত্রের মঙ্গল ও যথার্থ শিক্ষা বিধান জনক জননীর বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পুত্রের এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়াই উচিত। কিন্তু স্নেহের স্থানে গিয়া আঘাত লাগিল। কমলা কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

নরেন্দ্রনাথ আবার বলিল, "কি বল মা, আমি ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে গিয়া ব'লে আস্‌ব।"

দেবেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও কথার আমি কি বলবো রে?"

নরেন্দ্রনাথ পিতার নিকট সরিয়া গিয়া বলিল, "বাবা! সন্ন্যাসীর সঙ্গে যেতে কি আপনার আপত্তি আছে?"

দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি হাসিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন হে! এই যে সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার আর্য্য রমণী বলে কত কথা বলে গেলেন; তোমরা যে শত্রুর কৃপাণের মুখে পুত্রকে সাজিয়ে দিতে পার।"

স্বামীর ব্যঙ্গ শুনিয়া, কমলা হাসিলেন না। শান্তভাবে বলিলেন, শত্রুর কৃপাণে সন্তান সাজিয়ে দিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই; তবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে নরেনকে পাঠাতে পারি, এতটুক শক্তি আমার আছে। কিন্তু তাতে ভাল হবে কি মন্দ হবে, সেটাত আর আমরা বুঝি না; তোমরা ভেবে দেখ।"

দেবেন্দ্রনাথ আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "বরাবর আমি কমলাকে অশিক্ষিতা বলিয়া বিদ্রূপ করিতাম, কমলার পাড়াগেঁয়ে রীতিনীতি লজ্জা সম্ভ্রমের বাহুল্য দেখিয়া উপহাস করিতাম; কিন্তু কমলার হৃদয়ের বল এতটা তাহাত জানিতাম না। দেবেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রকে বলিলেন, "নরেন! তোমার ঠাকুরমাকে সম্মত কর, তিনি যদি যেতে দেন, তবে যেতে পার্‌বে।

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরমাকে সম্মত করিল। সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া আপনার আন্তরিক অভিপ্রায় জানাইল। সন্ন্যাসীও সম্মত হইলেন।

পরদিন কিছু পাথেয় দিয়া, কাপড় চোপড় গুছাইয়া মাতা ছল ছল নেত্রে পুত্রকে বিদায় দিলেন। "ফুলরাণী" দাদার জন্য কাঁদিয়া ফেলিল! কমলা পুত্রস্নেহ ভুলিবার জন্য স্বামীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

পুত্রকে বিদায় দিয়া স্নেহময়ী জননীর চিত্ত অস্থির হইয়া রহিল। কত মনে আসিতে লাগিল। শত্রুর মনে যাহা না আইসে, মায়ের মনে তাহা আইসে। কমলা কতরূপে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের যেন অসুখ হইয়াছে, তাহার শরীর যেন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে! দীর্ঘপথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া নরেন্দ্র যেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক বৃক্ষতলে শ্রান্তি দূর করিতেছে, তাহার মাখনের মত দেহখানি যেন গলিয়া পড়িতেছে। নরেন্দ্র যেন "মাগো" বলিয়া নিতান্ত শ্রান্তভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে! সন্ন্যাসী কত আদরে নরেন্দ্রের গায়ে হাত বুলাইতেছেন, তাহাকে শাস্ত্র শিক্ষায় উৎসাহিত করিতেছেন!

বড় সুস্বপ্নও দেখিতে পাইলেন। এক দিন কমলা স্বপ্ন দেখিলেন, নরেন যেন কি এক দিব্য শুভ্রবেশে সজ্জিত হইয়া এক পর্ব্বতের উপর প্রস্রবন পার্শ্বে বসিয়া আছে, প্রস্রবনের স্বচ্ছ স্ফটিকের মতন প্রবাহ নরেন্দ্রের পদতল ধৌত করিতেছে। নরেন্দ্রের শুভ্র বেশ অতি সামান্য, কিন্তু বীর সজ্জা! কোটিতে কৃপাণ, হস্তে বর্ষা, পৃষ্ঠে ধনুঃশর। কি এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ অথচ দিব্য আলোকময় জ্যোতি নরেন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইতেছে! তাহার শান্ত করুণা কোমল নয়নপ্রান্তে যেন শান্তির তরঙ্গ খেলিতেছে! এমন সময় কৃষ্ণবর্ণ বেশে সজ্জিত দুই জন ফিরিঙ্গি যেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নরেনকে

বলিল; আমাদের সেলাম কর, তোমায় অনেক ধন রত্ন দিব। নরেন্দ্র নাথ সেলাম করিল না। তখন তাহারা কৃষ্ণ বেশ ছাড়িয়া ফুলসাজে সাজিল, তাহাদের শরীরের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল। তখন তাহারা বলিল, "দেখ আমরা কেমন সুন্দর; তোমাকে এমনি সুন্দর করিব, আমাদিগকে সেলাম কর।" পশ্চাতে ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ ফিরিঙ্গিকে গ্রাহ্য করিল না, তাহাদের প্রতি ভ্রূভঙ্গি করিল মাত্র! তখন সেই দুই ফিরিঙ্গিমূর্ত্তি সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। একজন অতি ভয়ঙ্কর সিংহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীষণ গ্রাস বিস্তারপূর্ব্বক নরেন্দ্রকে আক্রমণ করিতে আসিল; অন্য পার্শ্বে আর এক জন এক মহাকায় মহিষরূপে প্রচণ্ড শৃঙ্গে বালককে তাড়া করিল! দূরে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "সাবধান।" নরেন্দ্র নাথ মহাতেজে গ্রীবা উন্নত করিরা ভ্রুকুটি করিয়া ধনুঃশর গ্রহণ করিল। যেন কার্ত্তিকেয় শীকারক্রীড়ায় উল্লাসিত! নরেন্দ্রের শর-সন্ধানে সিংহ মহিষ টিকিতে পারিল না। পৃষ্ঠ দিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর শূন্যদেশ হইতে দুইটি দিব্য মাতৃমূর্ত্তি দেহগন্ধে দিক আমোদিত করিয়া নরেন্দ্রের দুই পার্শ্বে আবির্ভূতা হইলেন, এবং হাস্যমুখে নরেন্দ্রনাথের মস্তকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পুষ্পস্তবক নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মচারী নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি বিজয়ী হইয়াছ; লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েরই আশীর্ব্বাদ তুমি পাইয়াছ।" নরেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল!

স্বপ্ন ভগ্নে কমলার প্রাণ আনন্দিত হইল; আবার ভয়ও হইল! আমার শিশু নরেন্দ্রনাথ বিদেশে কি এইরূপ কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়াছে! মায়ের চক্ষে ধারা ছুটিল। তিনি স্বপ্নের কথা কাহাকেও বলিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, বাঙ্গালীর ছেলের কি এমন শক্তি

কখনও হইবে?—সিংহ মহিষের যুদ্ধে বাঙ্গালী জয় লাভ করিবে! এমন পুত্র বঙ্গনারী কখনও প্রসব করিবে?"

নরেন বাড়ী হইতে যাওয়ার পর ফুলরাণী মায়ের মুখ সর্ব্বদাই মলিন দেখিত। আজ দেখিল মায়ের মুখ যেন বড় প্রফুল্ল। সাহস পাইয়া ফুলরাণী বলিল, "মা! আজ একবার পদ্মিনী রাণীর গল্প বল না।"

কমলা অনেক দিন পর কন্যাকে গল্প শুনাইতে লাগিলেন। পদ্মিনীর কথা, কর্ম্মদেবীর কথা প্রভৃতি অনেক রাজপুত মহিলার স্বদেশভক্তি ও সতী ধর্ম্মের কথা বলিলেন। সীতা, দময়ন্তী, সুভদ্রা প্রভৃতি অনেক আর্য্য রমণীর কাহিনী বলিয়া মাতা দুহিতায় বাদ প্রতিবাদ সমালোচনা করিলেন। সেকালের উপন্যাস বলিলেন,—রাজকুমারী স্বয়ম্বরে সহস্র রাজকুমারকে উপেক্ষা করিয়া এক দরিদ্রের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহারই গলে মাল্য দিয়াছিলেন; রাজা কন্যার এরূপ স্বেচ্ছাচারে বিরক্ত হইয়া জামাতা সহ কন্যাকে বনবাসে দিলেন। কিন্তু রাজকুমারী স্বামীর বীরত্বে ও স্বীয় সতী ধর্ম্মবলে এক নূতন রাজ্য লাভ করিয়া আবার পিতার প্রীতি লাভ করিলেন। ইত্যাদি অনেক গল্প হইল।

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল, তখন একদিন অকস্মাৎ পুলিস আসিয়া দেবেন্দ্রর সম্মুখে এক ওয়ারেণ্টের শমন ফেলিয়া দিল। সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সেই আফিসের একজন নিম্নতন কর্ম্মচারী সেনাক্ত করিতে আসিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, কমলা প্রমাদ গণিলেন, বৃদ্ধা জননী দীনময়ী কাঁদিয়া উঠিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সকলকে অভয়াশ্বাস দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কোর্টে হাজির হইলেন এবং জামিন দিয়া মোকর্দ্দমা চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মোকর্দ্দমা গুরুতর। তিনি যে সাহেবের অধীনে চাকরী করিতেন, সেই সাহেব নালিস করিয়াছে, দাবী কারখানার মাল চুরি;

মূল্য দুই সহস্র টাকা। সাক্ষী আফিসের কয়জন কর্ম্মচারী; তিনি নিজে অনেক চেষ্টা করিয়া যে দুই জন বঙ্গীয় যুবকের চাকরী করিয়া দেন, তাহারাই প্রধান সাক্ষী। দেবেন্দ্রনাথ চিন্তিত হইলেন, গৌরাঙ্গের সঙ্গে মোকর্দ্দমায় কৃষ্ণাঙ্গের নিষ্কৃতির আশা চিরদিনই কম। তবে নিষ্পাপ অন্তরে বিপদের মধ্যে যে একপ্রকার নির্ভয় ভাবের অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক, দেবেন্দ্রনাথ সে ভাব হারাইলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতে আসিলে, কমলা সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া তাঁহার ভয় যেন কমিয়া গেল। তিনি জানিতেন, তাঁহার স্বামী নির্দ্দোষ; নির্দ্দোষের আবার ভয় কি? সাহেব পাষণ্ড, কিন্তু বিচারকেরা ত আর পাষণ্ড নয়? অবশ্য সুবিচার হইবে। কমলা বলিলেন, "আচ্ছা, সে সাহেবের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তবু সে এরূপ করিল কেন? সেই তোমাকে অপমান করেছে, তুমিত তার অপমান কর নাই?"

দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "সাহেবদের স্বভাব তুমি কি জান্‌বে? ওদের ইচ্ছা, এদেশের সকলেই সর্ব্ব বিষয়ে ওদের দাস হইয়া ওদের মুখ চাহিয়া থাকিবে। যদি কেহ ওদের প্রভুত্ব উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন হইতে চায়, ওরা যেরূপেই পারে তাকে নিগৃহীত কর্‌বে। উদ্দেশ্য দেশের লোকে ভয় পাবে, আর কেহ সাহেব জাতির অপমানে মাথা উঁচু করিবে না।

কমলা। সাহেব জাতি এমন অধম? সাহেব জাতি যে আমাদের রাজা; এমন অধার্ম্মিক জাতির কি এত ঐশ্বর্য্য সম্পদ থাকে?

দেবেন্দ্র। সকল সাহেবই এরূপ নয়। প্রধানতঃ ব্যবসাদার সাহেবেরাই এইরূপ। তুমি আসামের চা-বাগানের কুলিদিগের বিবরণ শুনিয়াছি? চা-বাগানের সাহেবদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।

কমলা। তবে বিচারকর্ত্তারা সুবিচার করিবেন।

গৌরাঙ্গ বাদীর মোকর্দ্দমায় কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিবাদীর সুবিচার পাওয়া যে আজ কালকার ধর্ম্মাধিকরণে দুষ্প্রাপ্য, দেবেন্দ্রনাথ সে কথা পত্নীকে জানাইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বলিলেন, "হ্যাঁ! ধর্ম্ম থাকিলে অবশ্য সুবিচার হইবে।"

কমলা বলিলেন, "আমিই তোমার এই বিপদের হেতু!"

দেবেন্দ্র। না কমলা, এ বিপদ নয়, এ আমার সম্পদ্। তুমি আমার সম্পদেরই কারণ। ভেবে দেখ যারা একটু পাশ কাটিলেই এরূপ করিতে পারে, তাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে জীবিত থাকা, আর কালসর্পের বিবরে বাস করা উভয়ই তুল্য। যে হিংস্র, সে সুযোগ পাইলেই দংশন করিবে! তুমিই আমার চোক্ ফুটাইয়া দিয়াছ, তাই আমি এই নৃশংস রাক্ষসের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারিয়াছি। শোন, যদি আমি আজীবন কাল ঐ সাহেবের দাসত্ব করিয়া দেড় শত, দুই শত বা তদ্ধিক মুদ্রা বেতন পাইতাম, তাহাতে আমার কি হইত? ত্রিশ টাকা হইতে দেড় শত টাকা পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার কি সম্পদ্ বাড়িয়াছে? ইংরেজের টাকা আয় করিয়া কেহ ঘরে রাখিতে পারে না। তা যদি পারিত, তবে বাঙ্গালীর অবস্থা এমন শোচনীয় হইত না। যা'ক সে কথা। ফিরিঙ্গির কোপে পড়িয়া আমি জেলে যাই, দ্বীপান্তরে যাই, সর্ব্বস্বান্ত হই, আমি তাতে বিপদ গণিব না। মনে মনে গৌরব করিব,—আমি স্বাধীন, ম্লেচ্ছের দাসত্ব হইতে মুক্ত!

তখন ফুলরাণী তাড়াতাড়ি পিতার কাছে পড়া শিখিতে আসিল। আজ কয়দিন তাহার পড়া শিখা হয় নাই। ফুলরাণী তাহার ঋজুপাঠ বাহির করিয়া পড়িল, "বিপদি ধৈর্য্যম্ অথাভ্যুদয়ে ক্ষমা" ইত্যাদি।

কমলা বলিলেন, "ফুল! এখন কি তোর পড়ার সময়?"

দেবেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, ফুল পড়িতে আসে নাই, পড়াইতে আসিয়াছে। "বিপদি ধৈর্য্যম্," বাস্তবিক এই সত্য আমাকে বিপদ কালে স্মরণ করাইয়া দিতে ফুল আসিয়াছে।" বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ কন্যাকে পড়াইতে লাগিলেন।

মাঝে কমলা একবার বলিলেন "সেই তুমি যাদের চাকরী করে দিয়েছিলে, তারা কি তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিবে ?"

দেবেন্দ্র। দিবে বই কি কমলা! নিশ্চয়ই দিবে। সেইত আমাদের স্বভাব। নইলে কি সোণার বাঙ্গালা বিদেশীর পদে দলিত হয় ? নইলে কি মুষ্টিমেয় বিদেশী সাত কোটী বাঙ্গালীকে বশে আনিতে পারে ? আমাদের নীচত্ব শুনিয়া তুমি অন্তরে বেদনা পাইবে ; কিন্তু তবু বলিব শোন। আমি আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর মিথ্যা নিন্দা সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়া, পদোন্নতি লাভ করি। তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিতেই হইবে। কমল! তোমরা ঘরে থেকে কি জান ? পুরুষেরা যে কি উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে তাকি তোমরা বুঝ্তে পার ? স্বামীর পদোন্নতি শুনে, বঙ্গগৃহিণীগণ পুলকিত হন, কিন্তু স্বামী যে স্বার্থের মুখে মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নিগৃহীতের অভিসম্পাতে জীবন বিষাক্ত করিয়া গোলামীর নিম্নতম সোপানে নামিতেছেন, তাহা কি সেই গোলাম-মহিষীগণ জানিতে পারেন ? ঐ যে স্বর্ণকণ্ঠী আর হীরক চেন, উহা যে কোন্ নরক রাজ্যের সম্পদ্ তাহা কি তাঁহারা জানিতে পারেন ?"

কমলা স্বামীর মুখের দিকে করুণ-কোমল দৃষ্টিতে চাহিলেন মাত্র, কোনও কথা বলিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব পণে মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। অনেক বন্ধুজনে পরামর্শ দিলেন, সাহেবের কাছে ক্ষমা চাহিয়া মোকদ্দমা মিটান উচিত। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। এক পক্ষে ফিরিঙ্গি বড় মানুষ,—বড় হৌসের কর্ত্তা বাদী, অন্য পক্ষে চাকরী-ত্যাগী দরিদ্র বাঙ্গালী প্রতিবাদী—নিষ্কৃতির আশা বলবতী ছিল না, তবু দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মোকদ্দমার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৈজসপত্র অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই কৃষকদিগকে ধার দিয়াছিলেন, এখন তাহা পাইবার সম্ভব নাই। অল্প যাহা হাতে ছিল, তাহাতে কুলাইল না। কমলা অবশিষ্ট অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, তাহা বাহির করিয়া দিলেন। বিবাহের সময় শ্বশুর ঠাকুর কমলাকে যে ছোট বালা দু'গাছি দিয়াছিলেন, যাহা এখন আর কমলার হাতে লাগিত না, শ্বশুরের পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্য কমলা তাহা বড় যত্নে রাখিয়াছিলেন, তাহাও আজ দিতে হইল! অনেক স্বদেশবৎসল উকিল ব্যারিষ্টার ফিরিঙ্গির অন্যায় হইতে স্বদেশী ভ্রাতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বিনা বেতনে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষসমর্থন করিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মোকদ্দমা কলিকাতার কোর্টে হইল না, মফঃস্বলের কোর্টে হইল। সাহেবদিগের সেইরূপ প্রার্থনা। সুতরাং মফস্বলের জল বায়ুর ভয়ে ভীত হইয়া,—কাহারও জল বায়ু একরূপ

সহ্য হয়, কিন্তু পায়খানার কষ্ট অসহ্য,—ফলে উকিল ব্যারিষ্টার কাহারও আসা হইল না। দুঃখিত হইতেছি বলিয়া তারে খবর আসিল! মোকদ্দমা হইয়া গেল;—দেশীয় হাকিমের কাছে সাহেব বাদীর মোকদ্দমা,—হাকিম সাহেবের মনোভঙ্গ করিয়া শেষে কি অন্নাভাবে সপরিবারে মারা যাইবেন? মিথ্যা সাক্ষ্যও অনেক মিলিল। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে একজন যুবক সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, ইনিও সাহেবের কর্ম্মচারী, অল্প দিন হোসে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সাহেবের বিরাগ, সুতরাং নিশ্চয়ই কর্ম্মচ্যুতি জানিয়াও, প্রকৃতি তাহাকে মিথ্যা বলিতে বাধা দিল। যাই হ'ক, বিচারে দেবেন্দ্রনাথের ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল, পরন্তু দেওয়ানি করিয়া দাবীর ক্ষতি পূরণ লইবার অধিকার সাহেবকে দেওয়া হইল!

এ সংবাদ বাড়ীতে পৌঁছিল। মাতা দীনময়ী আজ পীড়িতা, পুত্রের কারাবাস সংবাদে মূর্চ্ছিতা হইলেন! কমলা সংসার শূন্য দেখিলেন! হায়! কলিতে ধর্ম্ম কি এতই শক্তি-শূন্য!

কমলা কি করিবেন কি ভাবিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এত দূর হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও ভাবেন নাই। ভাবিবার কাঁদিবার সময়ও কমলা পাইলেন না। সম্মুখে বৃদ্ধা শাশুড়ী মূর্চ্ছিতা ও মরণাপন্না! হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হস্তপদে বল নাই, তবুও যতদূর শক্তি শাশুড়ীর সেবা করিলেন! ফুল কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? হায়! আজ যদি আমার নরেন্দ্রনাথ বাড়ী থাকিত, অবশ্য সে তাহার পিতার জন্য অনেক করিতে পারিত। ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাইলে তাঁহার দৈব শক্তিবলে এ বিপদ্ উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন কি উপায় করি? কারাবাস যন্ত্রণা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? কারাধ্যক্ষেরা বড় নিষ্ঠুর; তারা মানুষকে

বড় পীড়ন করে, আধপেটা খেতে দেয়, পশুর মতন কাজে খাটায়, প্রহার করে! প্রাণে আর সহিল না! কমলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

সংবাদ পাইবামাত্র বামা ঠাকুরাণী আসিয়াছেন, গ্রামের আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ আসিয়াছেন। কৃষক প্রজারা কাজ ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। সকলেই আশ্বাস দিলেন, "মা! ভয় নাই! আমরা আপিল করিব। আপিলে মোকদ্দমা ভাল হইবে।" কমলার নারী-হৃদয় আর প্রবোধ মানিতে পারিল না।

বামা দেবী বলিলেন, "বউ; অতটা ।অধির হইও না। কলিতে ধর্ম্মের নিগ্রহ এইরূপই হইয়া থাকে, তবে এটা জানিও, অধর্ম্মের জয় দু' দিনের জন্য; ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। বিচার কর্ত্তারও বিচারকর্ত্তা আছেন।"

কমলা। আর কোনও আশ্বাসে নির্ভর করিতে পারি না মা! আমারই জন্য তাঁর এই দুর্দ্দশা! কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল; রুদ্ধকণ্ঠে অতি কষ্টে তিনি বলিলেন, "সাহেব সর্ব্বস্ব নিয়েও কি তাঁ কে ছাড়্‌বে না?"

বামা। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের মুক্তি হইবে। তুমি ইষ্ট দেবতাকে ডাক, নারী জাতির যাহা সাধ্য তাই কর, সতীর যাহা কার্য্য তাহারই অনুষ্ঠান কর। অনাহারে অনিদ্রায় ভগবানের কাছে কৃপা ভিক্ষা কর। সাবিত্রী পতির জীবন ভিক্ষা পাইয়াছিলেন।

কমলা। সেরূপ সতীত্ব-বল আমার নাই। কিন্তু মা, আজীবন সাহেবের দাসীত্ব করিয়া যদি তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারি তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি। লজ্জা, সম্ভ্রম, মান, ইজ্জত, সমস্ত পরিত্যাগ করিতে আমি প্রস্তুত! যাঁর জন্য মান ইজ্জত, তিনি কয়েদ ঘরে জহ্লাদের হাতে পীড়ন সহ্য করিতেছেন, এমন সময়ে নারী

জাতির মান ইজ্জত কি? আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি গিয়া হাকিমের পায়ে পড়ি, উকিলের পায়ে পড়ি, সাহেবের পায়ে পড়ি! কিন্তু কি করিব? মার যে এই অবস্থা! অভাগিনী পুত্র পৌত্র বেঁচে থাকতে, তা'দের হাতে জল আগুন পেলেন না।

আবার কমলার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে যেন কঠিন বজ্রঘাত হইতেছিল, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে দেহের শোণিত শুকাইয়া যাইতেছিল। কতক্ষণ পরে কমলা আবার বলিলেন, "কি করিব, আমার শাশুড়ী মরণাপন্না; তাঁহাকে ফেলিয়া গেলে তিনি বিনা সেবায় মারা যাইবেন। তিনি যাঁহার জননী, তিনি মাতৃ-সেবায় জীবন দান করিতে পারেন। তাঁহার জন্য তাঁহার মাতাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া গেলে তিনি সুখী হইবেন না। আমিও ধর্ম্মে পতিত হইব। আমার শাশুড়ীর ন্যায় মাও কাহারও নয়, তিনি আর বাঁচিবেন না! আমার সকল সুখের পথেই কাঁটা পড়িল।"

বামা ঠাকুরাণী অন্য এক পীড়িতের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া সে দিন কমলার বাড়ীতে থাকিতে পারিলেন না। রাত্রিতে কমলার বাড়ীতে থাকার লোক ঠিক করিয়া চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ তিলক সাহা বাড়ী হইতে হুকা কল্‌কি তামাক লইয়া সকাল সকাল আসিয়াছে। তাহাকে ডাকিতে হয় নাই, নিজেই আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সতী সাধ্বী কমলাকে সাহায্য করা সে নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিল। প্রজারাও সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। প্রতিবেশী ভদ্রলোকেরাও যথেষ্ট সহানুভূতি করিয়া আসা যাওয়া করিতে লাগিল।

এই বিপদের সময়ে কমলার আর একটি কথা মনে পড়িল। একবার কলিকাতায় থাকিতে নরেনের বড় জ্বর বিকার হইয়াছিল; বড় বড়

ডাক্তার কবিরাজ জীবনের উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন। সে সময়ে কলিকাতার অনেক বন্ধু বান্ধব আসিতেন; কিন্তু কেহ দ্বারে দাঁড়াইয়া কেহ ঘরে একবার ঢুকিয়া দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু এমন প্রাণময় সান্ত্বনা ত কেহ দিতে পারিতেন না। মাতা ঠাকুরাণী পীড়িতা; তাঁহার পথ্যের জন্য প্রতিবেশী ও প্রজারা যে পরিমাণে আতা, কমলা, আনারস, দুধ, মিশ্রি দিয়াছে, বিশ টাকা খরচেও তেমন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সহরে থাকিয়া যদি আমার এরূপ ঘটিত, তবে আমার কি উপায় হইত?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*:০:*—

দুই রাত্রি দুই দিন কমলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা আপিল করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা ফিরেন নাই। বালিকা ফুলরাণীর কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়ঙ্কর জ্বর হইয়াছে। বালিকা প্রলাপ বকিতেছে; "বাবা গো" বলিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ফুলরাণীর ভাব দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়।

বিপদের সময়ে প্রকৃতিও ভয়ঙ্করী হইয়া পড়ে! নিশীথ কাল; আষাঢ়ের ঘন ঘটায় জগৎ সমাচ্ছন্ন; মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুচ্চমক ও মেঘগর্জ্জন হইতেছে! অবিশ্রাম মুষলধারে বৃষ্টি পতনের ঝাঁ ঝাঁ শব্দে অন্য কিছুই শ্রুতিগোচব হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে প্রবল বেগে বাতাস বহিয়া দুর্য্যোগ আরও ভয়ঙ্কর ও চমকপ্রদ করিয়া তুলিতেছে। কমলা নিঃসহায়! অকূল সাগরে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত নিঃসহায় তরণীর ন্যায় কমলা প্রতিমুহূর্ত্তেই গভীরতর বিপদের অপেক্ষা করিতেছেন! বাহিরে তিলক সাহা এক একবার বলিতেছে, "মা ভয় নাই! আমি জেগে আছি।"

কমলার চক্ষে জল নাই! তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার সব ফুরাইল। মাতৃসমা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অন্তিম সময়ের আর বিলম্ব নাই! বালিকা ফুলরাণীও বুঝি স্বর্গে চলিল। নরেন্দ্রনাথ কোথায়? ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সে নিরাপদ্ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু দেব-পুরুষ ব্রহ্মচারীর

সঙ্গে থাকিলে কি হয়, আমার কপাল যে ভাঙ্গিয়াছে! স্বামী কারাগারে শাশুড়ী ও কন্যা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে উদ্যত, পুত্র বিদেশে,—মর্ত্তে কি স্বর্গে জানি না। আর বাকি কি? এই ত আমার সময়! কিন্তু এই মরিবার সময়ে যদি তাঁহার পা মাথায় রাখিয়া, আর আমার নরেন্দ্রের মুখ দেখিয়া মরিতে পারিতাম, তবে আমার মতন ভাগ্যবতী কেহ ছিল না! মাতৃহীন,—পিতৃহীনও বটে, হতভাগ্য শিশু সুরেন্দ্র রহিল; বামা ঠাকুরাণী আছেন, সংসারে শত শত জননী আছেন; তাঁহাদেরই স্নেহে আমার শেষ বুকের মাণিক ভাসাইয়া যাইব।

এমন সময়ে বৃদ্ধা দীনময়ী চক্ষু মেলিলেন এবং অতি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "বউ মা!"

"মা!" বলিয়া কমলা শাশুড়ীর বুকে হাত দিলেন। মাতা বলিলেন, "দেবেন্দ্র এসেছে?" কমলা নিরুত্তর রহিলেন। বর্ষাসারস্রাবী পদ্মের ন্যায় তাঁহার কপোল বহিয়া ধারার উপর ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মাতা বলিলেন, "ভয় নাই মা। দেবেন্দ্রের উদ্ধার হইবে। ব্রহ্মচারী আমাকে স্বপ্নে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তুমিই তাকে উদ্ধার করিবে। তুমি তার কি চেষ্টা করিতেছ?"

কমলা। কি করিব মা? তুমি অচৈতন্য, ফুলের ঘোরতর বিকার, আমি কোন্ দিক রক্ষা করিব?

মাতা। ভয় নাই, আমি ভাল হইয়াছি, ফুলও ভাল হইবে। আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না; তুমি দেবেনকে মুক্ত কর।

কমলার মনে মনে ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি লজ্জা মান ত্যাগ করিয়া নিজেই কলিকাতায় গিয়া সাহেবের পায়ে ধরিবেন, সাহেবের স্ত্রী আছে; তাহারও পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবেন।

অবশ্য তাহাদের অন্তর গলিতে পারে। না হয়, তাহাদিগকে জমি জমা বাস্তুবাটী সব দিব, তবুও কি ছাড়িবে না? কিন্তু শাশুড়ী কন্যার এই শোচনীয় অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিয়া কি করিয়া যাইবেন? আজ শাশুড়ীর জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে, ফুলের অবস্থাও ভাল, যেন বিকার কাটিতেছে, কমলার মনে ভরসা আসিল। কমলা মনে মনে ডাকিলেন, "হে অগতির গতি! অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের সহায়, পীড়িতের বন্ধু দয়াময় জগদীশ্বর! কৃপা কর, আমায় বল দাও, সাহস দাও। সতী সাবিত্রী তাঁহার সতীত্ববলে শমনের গ্রাস হইতে স্বামীর উদ্ধার করিয়াছিলেন; আমার তেমন সতীত্ববল নাই। বীরনারী পদ্মিনী বীরত্ব কৌশলে দুর্ব্বৃত্ত যবনের কারাবন্ধন হইতে বীরস্বামীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন; দুর্ব্বল বঙ্গনারী আমি, আমার সে বীরত্বও নাই কিন্তু আমি আর্য্যনারী, স্বামী দেবতা,—নারীর সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধন,—এশিক্ষা আমি পাইয়াছি, স্বামীর বিপদকালে, আর্য্যরমণী অন্দরবাসিনী হলেও মান ইজ্জত পরিত্যাগ করিতে পারে, এরূপ কাহিনী আমি শুনিয়াছি। তবে কেন আমি পারিব না? যিনি আমার হৃদয় মন্দিরের দেবতা, তাঁহাকে ঘৃণিত কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আমি কোন্ কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইব? আমিও কি কারাবাসিনী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারি না। শৈব্যা রাণী পরের দ্বারে বিক্রীত হইয়া স্বামীর ঋণ শোধ করিয়াছিলেন, আমিও আপনাকে কারাধ্যক্ষের কাছে বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিব। সাহেবের পায়ে ধরিব, বিনয় করিব, বুকের রক্ত চায়, তাও দিব, তাতেও না পারি, আমিও বীর হইব, আমার ভয় কি? পাষাণ্ড ফিরিঙ্গির বুকে ছুরি বিধাঁইব, পারিব না? কেন পারিব না? এই আর্য্যবংশে কত রমণীরা পারিয়াছেন, আমি পারিব না কেন? কোথায়

তোমরা আর্য্যকুল-সতীগণ, আমার হৃদয়ে বল দাও! আর্য্যনারী হৃদয়ে আবার তোমাদের আত্মা আবির্ভূত হউক. আবার আর্য্য সতীর তেজে আর্য্যপীড়ক পাষণ্ডদল ভস্মীভূত হউক। তেমন দিন কি হয় না?”

এমন সময়ে সেই দুর্য্যোগ কোলাহল ভেদ করিয়া বাহিরে শব্দ হইল, “মা! মা! দ্বার খোল!” কমলা চকিত হইলেন; “এ যে নরেনের কণ্ঠস্বর!” পর মুহূর্ত্তেই অন্য কণ্ঠধ্বনি হইল। “মা কেমন আছেন? ফুল বুঝি জেগে নাই।” জয় জগদীশ্বর! এ যে দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠধ্বনি!

কমলা দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন সেই প্রসন্ন বদন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাহার স্বামী, পুত্র সুস্থদেহে সমাগত! কমলা বিহ্বলার ন্যায় ব্রহ্মচারীর পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। স্বামী সম্মুখে মাথার কাপড় টানিয়া দিতে ভুলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, “মা! তুমি তোমার উভয় গুরুকে প্রণাম করিলে; আমি আশীর্ব্বাদ করি, বীরজননী হও। তোমার স্বামীগুরু কি আশীর্ব্বাদ করিবেন?”

কমলার চমক ভাঙ্গিল! অতিব্যস্তে অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। দেবেন্দ্রনাথও হাসিয়া বলিলেন, “প্রভু যাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাঁহার যে অন্য আশীর্ব্বাদ প্রয়োজন, তাহা আমি জানি না; তবু আপনার আদেশ ও রীতির অনুরোধে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ওর যেন গুরুপদে অচলা মতি থাকে।”

নরেন্দ্রনাথ আসন আনিল, সন্ন্যাসী উপবেশন করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মাতার পদধূলি লইয়া তাঁহার গায়ে হাত দিলেন; ফুল অতি কষ্টে উঠিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল। ব্রহ্মচারী ও দেবেন্দ্রনাথ যে ভাবে কথা বার্ত্তা বলিলেন তাহাতে বিপদের ছায়া কিছুই দেখিলেন

না; কমলা প্রসন্নমনে স্বামী পুত্রের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে গেলেন। সন্ন্যাসীর জন্য কিছু দুধ দেবেন্দ্রনাথ লইয়া আসিয়াছিলেন।

অতঃপর পুত্র গিয়া মায়ের কাছে খবর বলিতে লাগিল। মোকদ্দমা এখনও মিটে নাই। আপিল করিয়া জামিনে খালাস পাইয়াছেন। ব্রহ্মচারী বহু চেষ্টায় আপিল মঞ্জুর করিয়াছেন। পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে থাকিয়া ব্রহ্মচারী কিরূপে এই সংবাদ জানিতে পারেন ও আমাকে লইয়া ছুটিয়া আইসেন। ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, আপিলে মোকদ্দমা ভাল হইবে।

মোকদ্দমা "মিটে যাক্, তারপর সাহেবকে একবার দেখিব", বলিয়া বালক নরেন্দ্রনাথ ভ্রূভঙ্গি করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*:•:*—

ভগবদ্ কৃপায় ব্রহ্মচারীর আন্তরিক চেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথ আপীলে নিষ্কৃতি পাইলেন। তারের খবর পাইবামাত্র নরেন্দ্রনাথ অতি ব্যস্তে ঠাকুরমাও মায়ের কাছে গিয়া বলিল। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "জয় জগদীশ্বর! তুমিই নিষ্পাপের সহায়!"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "মা! এখন যে সাহেব আমার বাবার গায়ে হাত তুলিয়াছিল, আরও তাঁহাকে এত নিগ্রহ দিল, আমি তাহার মুখে পদাঘাত করিব; এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।" বালকের মুখশ্রী গম্ভীর, তাহাতে যেন কে রক্তপ্রলেপ মাড়িয়া দিয়াছে। কমলা পুত্রের ভাব দেখিয়া খুসী হইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারী আমায় বীরজননী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, আমার সে আশীর্ব্বাদ সফল হইল। কিন্তু বাবা! সাহেবের মার খাইয়া এই নিগ্রহ আর সাহেবকে মারিলে কি আর নিস্তার আছে? বাঙ্গালীর এরূপ বীরত্ব সাজে না।"

নরেন। কেন সাজিবে না মা? আমার শরীরে যে বল আছে, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সে সাহেবকে এক পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত করিতে পারি। আমি গুরুদেবের কাছে, এবার ধনুকে তীর চালাইতে শিখিয়াছি। তুমি যদি অনুমতি কর, আমি এক তীরে সাহেবের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিতে পারি।

কমলার সেই স্বপ্নের কথা মনে হইল। তিনি স্বপ্নে নরেন্দ্রনাথের যে বীরমূর্ত্তি দেখিয়েছিলেন আজও যেন নরেন্দ্রনাথ সেই মূর্ত্তিতে তাঁহার কাছে দণ্ডায়মান। কমলার মনে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিল। তিনি

বলিলেন, "নরেন! তোর দেহে শক্তি আছে তা আমি জানি; কিন্তু সাহেবকে মারলে কি রক্ষা আছে?"

নরেন। জানি, জেল হইবে। সাহেব আমাদের মারিলে, খুন করিলে কিছুই হয় না, আমরা সাহেবদের দিকে উঁচু, মুখে চাহিলে শাস্তি হয়, আমি সে ভয় করি না। পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইয়া, কারাবাস দীপান্তর বা ফাঁসী হয়, তাতে আমি ভীত নই,—বরং গৌরব মনে করি। আমরা যদি এমন ভাবে সাহেবদিগের অপমান প্রতিশোধ লইয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই ফিরিঙ্গিদল বাঙ্গালীগণকে একটু সম্মান করিবে! মা আগেকার আর্য্যমাতারা পুত্রকে শত্রুর অসিতে মরিবার জন্য সাজাইয়া দিতেন; দেশে তেমন দিন কি আর হয় না?"

মাতার নয়নে ধারা বহিল! পরাধীন বাঙ্গালীর ঘরে যতটুকু বীরজননী হইবার সম্ভব, তাহা আমি হইয়াছি। আহ্লাদে পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া, তাহার ললাটের বিশৃঙ্খল কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিয়া মাতা কহিলেন, "নরেন! পিতা মাতার অপমানে, যে সুসন্তান, তাহার এমনই ভাবই হইয়া থাকে। কিন্তু সাহেবকে মারিলে কি তার প্রতিশোধ লওয়া হয়? যে বলে সাহেব জাতি বাঙ্গালীকে ঘৃণা করে, বাঙ্গালীর মাথায় পা তুলিতে সাহস করে, যাহাতে সেই বল লাভ করিতে পারা যায় তাহাই পুরুষত্ব! সে বল কি জান? সাহেব জাতির অটুট আত্মনির্ভরশক্তি; অলসতার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও মনের অবিচলিত স্বাধীনতা! বাঙ্গালীরা মনে করে, আমাদের রাজা বিদেশী, আমরা স্বাধীন হইব কি প্রকারে? কিন্তু মনের স্বাধীনতা কি রাজার করায়ত্ত? রাজা রাজ্য শাসন করেন, মানুষের মানসিক স্বাধীনতার উপর তার শক্তি কি? রাজ্য লইয়া আমরা ইংরেজের অধীন, তাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমরা অশন বসন সাজ সজ্জা

সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া, সর্ব্ববিষয়েই তাহাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছি। তাই সাহেবেরা আমাদিগকে অপমান করে! ভেবে দেখ, আমাদের দেশেরই পাট, আমাদের দেশেরই তুলা; সাহেব সাগরের পার হইতে আসিয়া কারখানা করিয়াছে, আমাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। আমরা সাহেবের কারখানায় চাকর খাটিয়াই সন্তুষ্ট। তুমি আজ হইতে প্রতিজ্ঞা কর, সাহেবের চাকর খাটিব না, সাহেবকে চাকর করিব। সাহেবের অনুকরণে আমার কুলের রীতি নীতি, জাতিধর্ম্ম হারাইব না। তবেই সাহেবের প্রতিশোধ লওয়া হইবে। এবিষয়ে তুমি তোমার গুরুদেবের কাছে উপদেশ লইবে।"

মায়ের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ মাথা নীচু করিয়া থাকিল।

নরেন্দ্রনাথ সেবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে। ব্রহ্মচারী আসিয়া কহিলেন, তাহাকে আরও কিছুদিন ইংরেজী পড়িতে হইবে। তবে প্রতি বৎসর তিন মাস তিনি সঙ্গে রাখিয়া নরেন্দ্রনাথকে আর্য্যশাস্ত্র শিক্ষা দিবেন। নরেন্দ্র যে বৃত্তি পাইবে, তাহাতেই তাহার পড়ার খরচ চলিতে পারে।

এদিকে মোকদ্দমায় দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। যথেষ্ট ঋণ করিতে হইয়াছে। অভদ্রা বর্ষাকাল, পাঁচ দিন চলিতে পারে এমন সংস্থানও দেবেন্দ্রনাথের নাই। আবার বৃদ্ধা মাতা পীড়িতা! কৃষক প্রজারা এখন কিছুই সাহায্য করিতে পারে না; তাহাদের পত্তনের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে যে আশানুরূপ শস্য জন্মিবে এরূপ আশা করা যায় না। তাহা হইলে আয়াগ কালেও যে দুঃখ ঘুচিবে এমন সম্ভাবনা নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের ভাবনায় ভারাক্রান্ত হইলেন। এখন অন্য ভাব, আবার চাকরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন না করিলে ত উপায় নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বড় দায়ে পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথকে পুনরায় অর্থান্বেষণে বিদেশে যাইতে হইল। সে গ্রামে বহু কৃষক বাস করিত! পূর্ব্ব বৎসর পাটের ব্যবসায়ীরা খুব চড়তা দরে পাট খরিদ করায় এ বৎসর চাষারা বার আনা রকম ক্ষেত্রে পাটের চাষ করিল, কেবল নীচ নাবাল ক্ষেত্রগুলিতে ধান্যের পত্তন করিল। পাট ফলিল যথেষ্ট, কিন্তু শ্রাবণে পাট উঠিলে ব্যবসায়ীরা যোটবন্দি হইয়া পাটের মূল্য কমাইয়া একবারে সিকি মূল্য হাকিয়া বসিল। চাহিদার চেয়ে মালের আমদানী বেশী হইলে মূল্য কমিয়াই যায়, তাহাতে পাটের ব্যবসায় যাহাদের হাতে তাহারা কৃষকদিগের সুখ সুবিধা কখনও চিন্তাও করে না। কৃষক পল্লীতে হাহাকার উঠিল, তিন মণ পাট বেচিলেও এক মণ চাউল পাওয়া যায় না। মরশুমের উৎপন্ন সমস্ত বিক্রয় করিলে এক মাসের অন্ন চলিতে পারে, এ দিকে মুনিব মহাজনের তাগিদ, কৃষকদিগের এবার বাঁচিবার উপায় কি?

শশাঙ্ক দত্ত নামক এক তরুণ যুবক বামাদেবীকে ঠাকুর মা বলিয়া ডাকিত, বামাদেবী শশাঙ্ককে বড় ভালবাসিতেন। শশাঙ্ক আসিয়া বলিল, ঠাকুর মা, এইবার এদেশের চাষাপল্লী উজাড় হইয়া যাইবে। ইহাদের রক্ষার কি কোনও উপায় নাই।

বিষয়টা বামাদেবী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শশাঙ্ক বুঝাইয়া বলিল, যদি এই সঙ্কটকালে কৃষকদিগকে পেটের অন্ন সংস্থান

জন্য কিছু কিছু সাহায্য করা যায়, অন্নের দায়ে তাহাদিগকে অর্দ্ধ মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে না হয়, তবে আশ্বিনের শেষে তাহাদিগের ধান উঠিবে। তাহারা খাইয়া বাঁচিতে পারিবে। পাট ও এই ভাবে রাখিয়া দিতে পারিলে, ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন মত অধিক মূল্য দিয়া কিনিতে বাধ্য হইবে। আমাদের এই কৃষক পল্লী বাঁচাইতে দশ হাজার টাকা লাগিতে পারে। শশাঙ্ক বলিল, সে তাহার সামান্য শক্তিতে হাজার টাকা দিতে পারে।

বামাদেবী কথাগুলি ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিলেন। তিনি আরও বুঝিলেন, এই সকল অল্পজ্ঞান সরল কৃষকদিগকে অসময়ে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে আপন করিতে না পারিলে, তাহারা যেমন উচ্ছন্ন যাইবে, তেমনি হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া তাহারা যে খৃষ্টান পাদরীদিগের প্রলোভনে খৃষ্টধর্ম্মে যোগ দিতেছে, তাহাও আর ও বাড়িয়া যাইবে। বামাদেবীর সঞ্চিত প্রায় হাজার টাকা ছিল, তীর্থ ভ্রমণের জন্য তিনি এই অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই টাকা এই কার্য্যের জন্য তিনি ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে ত হইবে না। তিনি শশাঙ্ককে লইয়া কমলার কাছে গেলেন। দেবেন্দ্রও কমলা কথাগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়াই শুনিলেন। তখন দেবেন্দ্র বাবুর হাতে অলঙ্কার তৈজসাদি বিক্রয়ের হাজার দুই টাকা সঞ্চিত ছিল। দেবেন্দ্র বাবু তাহা এই কার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। কমলা বলিলেন, যদি কৃষকদিগের উপকার হয়, তবে এই অল্প টাকা নিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা যাউক, সকলের উপকার করা না যায়, যে কয়জনের উপকার করা যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি!

সেইরূপই কার্য্যারম্ভ করা হইল। দেবেন বাবু শশাঙ্ককে লইয়া, কৃষকদিগকে দশটী করিয়া টাকা আপাততঃ ধার দিলেন। তাহাদের

সঙ্গে চুক্তি হইল, তাহারা স্ব স্ব কৃষিজাত পাট গোলা জাত করিয়া রাখিয়া দিবে। দুই মাস অন্তেই মুল্য বাড়িবে, তখন বিক্রয় করিয়া নিশ্চয়ই লাভবান হইবে, তখন এই ধারের টাকার মাত্র শতকরা মাসিক আট আনা সুদে শোধ দিতে হইবে। খাইয়া বাঁচিবার মতন টাকা প্রয়োজন হইলে তাঁহারা আরও দিবেন।

এই ভাবে কার্য্যারম্ভ হইলে, সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিষয়টী শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার একজন ধনবান শিষ্যের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা আনিয়া এ কার্য্যে সাহায্য করিলেন।

সেই গ্রামে ছিলেন কয়েকজন পাটের দালাল ভদ্রলোক। তাঁহারা প্রতি বৎসর পাটের দালালী করিয়া; বিদেশী মহাজনদিগকে পাট খরিদ করিয়া দিয়া বিস্তর লাভ করিতেন। এ বৎসর সামান্য একটী যুবক শশাঙ্কের চেষ্টায়, তাঁহাদের ব্যবসায়ে বড় ক্ষতি হইতে লাগিল। তাঁহারা বড় ক্রোধ-তপ্ত মনে এই কার্য্যে প্রতিরোধ করিতে লাগিলে, ঠিক এমনি সময়ে দেবেন্দ্র বাবু মোকদ্দমায় পড়িয়া গেলেন। এই মোকদ্দমায় তাঁহাকে যেমন যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল, তেমনি গৃহের বাসন বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও খরচ চালাইতে হইল। মুক্তিলাভ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া অনটন চিন্তায় কাতর হইলে, কমলা স্বচ্ছন্দ হাসিমুখে বলিয়াছিলেন, কিসের জন্য এত চিন্তা? আমরা যখন কোনও অন্যায় দুষ্কর্ম্ম বা কাহারও অনিষ্ট চিন্তাও করি নাই তখন দয়াময় ভগবানের রাজ্যে আমাদের দুটী ক্ষুধার অন্ন অবশ্যই জুটিবে।

এই সময়ে সেই বাংলা ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিনের ভীষণ ঘুর্ণী-বায়ু অর্দ্ধ বাংলায় বক্ষে বিপ্লবের তাণ্ডবলীলা খেলিয়া চলিয়া গেল।

বাংলায় বড় আশার শরৎকাল, আনন্দময়ী দশভূজা আসিবার আর তিন দিন মাত্র বাকি। ভক্তের মণ্ডপে কত আনন্দে কত আশায় মায়ের প্রতিমা সাজাইবার আয়োজন হইতেছে, চারিদিকে বোধনের কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। পূজাবাড়ীতে দ্রব্য-সম্ভার ভারে ভারে আসিতেছে। ভাগ্যবান নাকারী নাটমন্দির সাজাইয়া মনোমত করিয়া তুলিতেছেন। পল্লী-বালকেরা আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে। কুল-বধূরা, যাঁহার বাড়ীতে মায়ের পূজা,—মনের অফুরন্ত আনন্দে অবিরাম পরিশ্রমে কার্য্যে নিযুক্ত,—যাঁহার বাড়ীতে পূজা নাই, তিনি প্রতিবাসী স্বজনের গৃহে প্রফুল্ল চিত্তে কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন।

এমন সময়ে প্রভাতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই অল্প অল্প বাতাস ছাড়িল। ক্রমে তাহা প্রবল ঝটিকায় পরিণত হইয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মহাপ্রলয়ের সূচনা করিল। পল্লীগ্রামের চালাঘর-গুলি ভূমিসাৎ হইল, সহস্র সহস্র বৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া পথ ঘাট বন্ধ করিয়া ফেলিল। মণ্ডপ পড়িল, প্রতিমা চুর্ণিত হইল পূজার আয়োজিত দ্রব্যসম্ভার বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কত নর নারী বালক বালিকা অপঘাতে প্রাণ হারাইল, গোশালায় গরু মরিল, বন্য পশুপক্ষীও কত মরিল। তাহার উপর আবার নদীর জল ফুলিয়া প্রবল বন্যায় গ্রাম ডুবিয়া দিল। সমস্ত রাত্রি যেমন প্রবল ঝড় চলিল, তেমনি প্রবল বৃষ্টিপাত এদিকে বন্যার জলে মাঠ ঘাট উঠান উদ্যান প্লাবিত। এমন আনন্দময় পূজার দিনে গগন বিদারী হাহাকার ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

কৃষকদিগের সামান্য কিছু আউস ধান উঠিয়াছিল, হৈমন্তিক ধান্য বড় আশাপ্রদই ছিল। তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল। এদিকে সঞ্চিত সেই পাটের গোলার চালা উড়িয়া গিয়াছে, নিম্নে বন্যার জল

ঢুকিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার তাহাদের শক্তি নাই। তাহারা হতাশ ভগ্নমনে একবারে জীবন্মৃতের মত হইয়া পড়িল।

উদ্যমশীল তরুণ যুবক শশাঙ্ক এই বিপদে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইল না। বামাদেবী বিধবা কুলকামিনী হইয়াও এ সময়ে গৃহকোণে লুক্কায়িত রহিলেন না। তিনি কমলাকে বলিলেন, চল দরিদ্র কৃষক পল্লীতে গিয়া তাহাদের সাহায্য করিব। দেবেনবাবুও বামাদেবীর আদেশ মান্য করিলেন। গ্রামের আরও কয়েকটী যুবককে সহচর লইয়া বামাদেবী, কমলা, দেবেন বাবু নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কৃষকদিগের, পত্র কুটীর গুলি নির্ম্মাণ করিবার সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভদ্র যুবকদল কাটারি কোদালী লইয়া মুজুরের মত কাজ করিতেছ। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুভ্রবসনা বিধবা প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণী বামাদেবী, আর লাল সাটি পরা শাঁখা হাতে সিন্দূর রঞ্জিত ললাটে যুবতী কমলা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। সঙ্গে কৃষক নর নারীও কার্য্যে যোগ দিয়াছে। বৃদ্ধ তিলক সাহা দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য নিশ্চল নেত্রে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ছুটিয়া আসিয়া বামাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইল। কমলার পায়ের ধূলি লইতেও বৃদ্ধ হাত বাড়াইল। কমলা ব্যস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ কি বাবা, পিতার বয়সী তুমি, বাপের কি মেয়ের পা ছুঁতে আছে?"

অশ্রুসিক্ত মুখে তিলক বলিল, "মা! আজ যেন আমি স্বর্গের ছবি দেখ্‌তে পাচ্ছি। এমন ত আর কখনও দেখি নাই। তোমরাই দেবতা, তোমরাই যথার্থ মা। আজ মা সন্তানের পূজা গ্রহণ কর্ত্তে হবে। এই আমার গয়া কাশী করিবার সামান্য দুই শত টাকা, আর আমার গয়া কাশী বৃন্দাবনে কাজ নাই, এই আমার সকল তীর্থ।

এই টাকা তোমরা কাজে লাগাও।” বলিয়া বৃদ্ধ টাকার থলিয়াটী বামাদেবীর পায়ের কাছে রাখিয়া আবার তাহার পদধূলি লইয়া দুই হাতে মাথায় মাখিল। বামাদেবীও ধারা বিগলিত নয়নে তিলকের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, “বাবা এ আমার দেবতার দান, আমি মাথায় করিয়া লইলাম।”

গণেশ নামক এক নমঃশূদ্র যুবক কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা, বিনয়, শিষ্টাচার করিয়াও সে ভদ্রলোকের ছায়ায় দাঁড়াইয়া, ভদ্র সমাজে সামান্য অধিকারও লাভ করিতে পারে নাই। উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ তাহাকে ইতর, অস্পৃশ্য বলিয়া, পরিহাস বিদ্রূপ করিয়া দূরে সরাইয়া দেন। সেই মনোদুঃখে সে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া খৃষ্ট মিশনারীদিগের প্ররোচনায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সে দেখিল বামাদেবীও কৃষক কুটীরে কুটীরে ঘুরিয়া ঝটিকা বিপ্লবে আহত রুগ্নদিগের সেবা করিতেছেন। সুপথ্য আনিয়া স্বহস্তে রোগীদিগকে খাওয়াইতেছেন। গণেশ আসিয়া বলিল, “মা, বামনের বিধবা তুমি, তুমি এই অস্পৃশ্য ইতরদিগের ছুঁয়ে, তাহাদের ময়লা বিছানায় বসিয়া এমন করিতেছ, ইহাতে তোমার জাতি যাইবে না ?”

বামা হাসিয়া বলিলেন, “আমি বামনের মেয়ে, তাইত তোমাদের সকলের মা। মা হয়ে সকলের এই বিপদকালে দূরে থাকিলে, মায়ের কাজ কি করা হইল ?”

গণেশ বামাদেবীর পদধূলি লইল, কিন্তু কমলার মুখ পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা বলিলেন, “কি বলতে চাও বাবা ?”

গণেশ বলিল, “আমি তোমার পা ছুঁয়ে, পদধূলি নিতে পারি কি ?”

কমলা তাড়াতাড়ি গণেশের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "গণেশ, তুমি যদি আমায় মা ডাক, আমার নারীজন্ম সার্থক হবে।"

গণেশ সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর না, আজ আমার ভ্রম কাটিয়া গেল। আমি হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইতে যাইতেছিলাম, আমার হিন্দুসমাজে যখন এমন মাতৃভাব এখনও সজাগ রহিয়াছে, তখন সকল ভদ্র হিন্দু আমাকে পদাঘাতে তাড়াইয়া দিলেও আমি এ সনাতন সমাজ ত্যাগ করিব না। মা, আমারও হাতে কিছু টাকা আছে, প্রায় পাঁচ শ হইবে, আমি তাহা দিতেছি তোমাদের পায়ে পূজা। তোমরাই উদ্ধার কর, এ পতিত অধম দীন কৃষক সমাজ।"

এইরূপে বামাদেবী ও কমলার পবিত্র মাতৃশক্তিতে দেবেন্দ্রনাথ ও শশাঙ্কের অক্লান্ত চেষ্টায় সে ঝটিকা বিপ্লবের বিপদ অনেক প্রশমিত হইল। সংবাদ শুনিয়া দূর তীর্থ ভ্রমণ হইতে সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারীও ছুটিয়া আসিলেন। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ অতি ভীষণ ভাবেই দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মচারী চেষ্টা করিয়া, তাহার অন্যান্য দেশের ভক্ত কর্ম্মী শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া পল্লীর এই অন্নাভাব দূরীকরণ জন্য উদ্যুক্ত করিলেন।

ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্রকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল, অনেক দূর দেশে যাইতে হইবে। বাংলা ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইতে হইবে। আবার তোমাকে কাজ করিয়া পরের কাছে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে নইলে তোমার এ সমর্থ জীবন ব্যর্থ ভাবে যাপন করায় পাপ সঞ্চয় হইবে, অনটন দুঃখও ঘুচিবে না। কৃষক প্রজারা যতদিন আগামী মরশুমে সুফল লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন তাহারা তোমাদের ধার শোধ করিতে পারিবে না। কার্ত্তিকে তাহারা সামান্য রবিশস্যের পত্তন করিয়াছে, তাহার ফলে

মাঘ হইতে তাহাদের অন্নকষ্ট কথঞ্চিৎ কমিতে পারে, কিন্তু আগামী ধানের মরসুম না আসিলে তাহাদের স্বচ্ছল অবস্থা হইবে না। এবার তাহাদিগকে আর পাটের চাষ করিতে দেওয়া হইবে না, শুধু ধানের চাষ করাইতে হইবে। তাহা হইলে, পুরাতন পাট যাহা আছে তাহা দ্বিগুণ দরে বিক্রয় হইবে। চল, কালই শুভদিন, যাত্রা করিতে হইবে।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, মাতা রুগ্না ও বৃদ্ধা এ অবস্থায় কমলার উপর সংসার ভার ন্যস্ত রাখিয়া দূর দেশে যাইতে যে আমি ভয় পাই। বিশেষ পাটের দালাল মহাজনেরা আমাদের উপর চড়াও হইয়া উঠিয়াছে। এ দিকে খ্রীষ্টান মিশনারীগণও চাষা সমাজে প্রভুত্ব হারাইয়া আমাদের উপর বিরূপ হইয়া পড়িয়াছে। আমিও দূর দেশে যাইতে বড় ভয় পাই।"

ব্রহ্মচারী কমলাকে বলিলেন, "এইত সময় আসিয়াছে মা, এখন যথার্থ আর্য্য সীমন্তিনীর মত শক্তি লইয়া, অসুর শক্তির বিরুদ্ধে নিজের মান ইজ্জত রক্ষা করিতে হইবে। পারিবে না মা, একাকিনী গৃহে থাকিয়া স্বামীর সংসারের সম্মান পবিত্রতা রক্ষা করিতে ?"

কমলা বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন, পদধূলি দিন গুরুদেব, আমি একাকিনী গৃহে থাকিয়া মান ইজ্জত বাঁচাইয়া চলিতে পারিব। কিন্তু আপনার পুত্র আবার পরের দাসত্ব করিতে যাইবেন, এটাত আমার ভাল লাগে না।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, এবার আমি দেবেন্দ্রনাথকে এমন কাজে নিযুক্ত করিব, যাহাতে দাসত্বের দুর্ব্বলতায় হৃদয় ছোট হয় না, অন্নদাতার কাজ করিয়া পবিত্র আনন্দ লাভ হয়। যে কাজে দেশের সেবা দশের কাজ হয়, এমন কাজে আমি দেবেন্দ্রের কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—০*০*০—

স্বামী পুত্র বিদেশে; বৃদ্ধা শাশুড়ী রুগ্না; গৃহে অন্ন নাই, কপর্দ্দক মাত্রও সম্বল নাই। খোকা বলিল, "মা! রাঁধ্‌বে কখন? বড় ক্ষিদে লেগেছে!" বার বৎসরের বালিকা বুঝিয়াছে, আজ ঘরে অন্ন নাই। সে শিশু ভ্রাতাকে বলিল, চল ভাই, বাগানে গিয়ে তোমায় পেয়ারা পেড়ে দেব।

কমলার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। হায়! এতই অদৃষ্টে ছিল! এখন ছেলেটী মেয়েটীর দুটী ক্ষুধার অন্নও যোগাইতে পারিলাম না! এরা ত কখনও অন্ন বস্ত্রের কষ্ট জানিত না! আমার সোণার চাঁদের মুখ আজ অন্নাভাবে শুষ্ক! আজ আমি কি দিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচাব? মা পীড়িতা; জীবনে ত তিনি কখনও যন্ত্রণা জানেন না, তাঁর যেরূপ অবস্থা, ভালরূপ সুপথ্য দিয়ে তাঁকে সবল রাখা উচিত! কিন্তু আজ দুটি লবণ ভাতও তাঁকে দিতে পার্‌লাম না!

কাঁদিলে যে কান্নার শেষ হয় না। পূর্ব্বদিন কমলা কিছুমাত্রও আহার করেন নাই,—ভাতে কুলায় নাই! কিন্তু কমলার ক্ষুধা বোধ নাই। কাল একজোড়া মোজা ও এক খানি কাঁথা বিক্রয়ের জন্য বামা ঠাকুরাণীর কাছে পাঠাইয়াছিলেন; কেহ তাহা কিনিল না। স্বামী বাড়ী হইতে যাওয়ার পর কমলা, মোজা, কার্পেট, পাখা, কাঁথা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয়ে সংসারের খরচা চালাইয়াছেন।

কিন্তু এখন আর খরিদ্দার মিলে না। অভদ্রা ভাদ্রমাস, দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ম্মূল্য; সকলেরই অন্নকষ্ট; কে আর অনাবশ্যকীয় জিনিস খরিদ করে? তাহাতে সম্মুখের বৎসর ভীষণতর হইবারই সম্ভব। দেশ বন্যায় তলাইয়া গিয়াছে, ফসলের কিছুমাত্রও ভরসা নাই। চাষারা ক্ষেত ছাড়িয়া নিরানন্দে জানুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়াছে! দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত! সকলেই মহাভীত হইয়া পড়িয়াছে! চাউলের মূল্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

কমলা ভাবিলেন, আমিই এ দুর্দ্দশার মূল। কেন সে সময়ে চাকরী ত্যাগ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলাম? এখন কি করিব? ভিক্ষা ভিন্ন ত আর উপায় নাই! বামা ঠাকুরাণীর যাহা ছিল, গ্রামের দুঃখী-জনেরা তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে, তিনি কোনও সাহায্য করিতে অক্ষম! তবে কি ভিক্ষা করিব? ভিক্ষা ভিন্ন আর ত উপায় নাই। রোদন ভিন্ন কমলা আর কি করিবেন; অবিশ্রান্ত চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে কমলা সামান্য সামান্য গৃহ কর্ম্ম সারিতেছিলেন। মাতা কহিলেন, "কাঁদলে কি হবে মা? ভগবান্‌কে ডাক।

তখন বাহির হইতে কে ডাকিল, "ও ফুল? ফুলরাণী।" কমলা দেখিলেন ওপাড়ার শশাঙ্ক দত্ত এক বস্তা চাউল নিজেই মাথায় বহিয়া আনিয়া পীড়ার উপর রাখিয়া ডাকিতেছে। কমলাকে দেখিয়া যুবক বলিল, "মা! এই চাল নিন্, বামা ঠাকুরাণী পাঠাইয়াছেন।" বলিয়া— শশাঙ্ক চলিয়া গেল, কি এক অনির্ব্বচনীয় আবেগে কমলার হৃদয় ভাসিয়া গেল! ভদ্রলোকের ছেলে মাথায় মোট বহিয়া আমার অনাহারী পুত্র কন্যার আহার যোগাইয়া গেল! আমি কি দিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব? শশাঙ্ক চাউলের ব্যবসায় করে, তাহার দোকানে দশ টাকারও অধিক কমলার ধার রহিয়াছে! সেই লজ্জায় এবার কমলা তাহার কাছে চাউল আনিতে যান নাই। শশাঙ্ক সাধিয়া মাথায়

মোট করিয়া চাউল দিয়া গেল! সে বলিল বামা ঠাকুরাণী পাঠাইয়াছেন, কিন্তু বামা ঠাকুরাণী ত বলিয়াছেন—তাঁহার হাতে টাকা নাই।

যাহা হউক সর্ব্বান্তঃকরণে শশাঙ্ককে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, কমলা ভাত রাঁধিতে গেলেন। একটু পরেই বামা ঠাকুরাণী আসিলেন। কমলা বলিলেন, "মা! তুমি চাউল পাঠাইলে কিরূপে? তোমার হাতে ত টাকা ছিল না?"

বামা। আমি চাল পাঠালেম কে বল্লে? কে দিয়ে গেল?

কমলা। কেন? ওপাড়ার শশাঙ্ক দত্ত! তিনি বল্লেন তুমিই পাঠাইয়াছ।

বামা। শশাঙ্ক চাল দিয়ে গিয়েছে? লক্ষ্মী ছেলে বটে!

কমলা। তুমি তাঁকে চাল দিতে বলেছিলে?

বামা। বউ, তুমি শশাঙ্ককে জান না; ওর মত ছেলে এ গ্রামে কেন, এ বাঙ্গলায় দুটী আছে বলে বিশ্বাস নাই। ওর কাছে কাল আমি তোমাদের কষ্টের কথা বলেছিলাম। তখন কিন্তু বলেছিল,—তাইত কি করি, ধারে দিয়ে আমার কারবার যে বন্ধ হয়ে যেতে চল্ল।"

কমলা। ওর অবস্থাও তত ভাল ব'লে জানি না। ঐ ছোট দোকানটীইত সম্বল!

বামা। অবস্থা ভাল নয়; কিন্তু লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে। শোন ওর কথা বল্‌ছি। ওর বাবা যখন মারা যায় তখন ওর বয়স ১৬।১৭ বৎসর, ওর আর দুটী ভাই নিতান্ত শিশু। ওরই ঘাড়ে সংসার চাপিল। ছেলেটী একটা পাসও করেছিল; চাকরী কর্‌লে কর্ত্তে পার্‌ত, সেদিকে মন গেল না। ২৫টী টাকা ধার করে কারবার আরম্ভ কর্‌ল। হাটে হাটে মাথায় মোটে কেনা বেচা করিত। ভদ্রলোকের ছেলে, কিন্তু

তা ব'লে অভিমান ছিল না। লোকে কিছু বল্লে, বল্‌ত,—মা ভাইএর অন্ন যোগান বড়, না মান বড়? ক্রমে সেই ব্যবসায়ে উন্নতি করে সংসার চালিয়েছে। কারবার ক্রমেই বড় হচ্চে; একখানি নৌকা করেছে; কয়জন লোকও রেখেছে, যে দেশে যে জিনিষ সুলভ, সেই দেশ থেকে সেই জিনিষ কিনে অন্য দেশে পাঠায়।

কমলা। ছেলেটী খুব বুদ্ধিমান্!

বামা। যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি ওর শরীরে অটুট্ বল। সমস্ত দিন পরিশ্রমেও কাতর হয় না। এখনকার ইংরেজী পড়া ছেলের মতন ও সূর্য্যের তাপে এলায়ে পড়ে না। সেই ছেলে বেলা থেকে ও বাড়ীতে পাঁচ বিঘা বাগান সাজিয়েছে। ওর বাগানে আম কাঁটাল, নারিকেল, সুপারি, কলা, না হয় এমন জিনিস নাই। তাতে বার্ষিক ওর দু'শ টাকা আয় হয়। দুটী ভাইকে লেখাপড়া শিখায়েছে; মাকে রাজরাণীর মতন সুখে রেখেছে! গরীব দুঃখীর মুখের দিকেও চায়। নিজের বিলাস বাবুগিরির প্রতি লক্ষ্যও করে না। অন্তঃকরণেও দেব তুল্য! আজও বিবাহ করে নাই; কিন্তু স্বভাবে শিব তুল্য!

কমলা। বিবাহ করে না কেন? মা আছে, বিবাহ দেয় না?

বামা। ও বলে এখনও ওর এমন অবস্থা হয় নাই যে বিবাহ কর্ত্তে পারে। ভাইরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'লে বিবাহ করবে। গৃহকর্ম্মে নিজেই মার সাহায্য করে! শশাঙ্কের সাহসের কথা শুন্‌লে তুমি অবাক্ হবে। ও লাঠী মেরে বাঘ তাড়াতে পারে! বন্দুক লইয়া বনে জঙ্গলে শীকার করে বেড়ায়; দশ জন পুরুষেও ওকে বলে আঁটতে পারে না!

কমলা। ওর মা বাস্তবিকই রত্নগর্ভা! ভগবান্ ওকে রাজরাজেশ্বর করুন।

বালিকা ফুল গল্প শুনিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, "উনি নিশ্চয়ই রাজা হবেন।"

বামা ঠাকুরাণীর চলিয়া গেলেন। কমলা ভাত তরকারী রাঁধিয়া শাশুড়ী ও পুত্র কন্যাদিগকে খাওয়াইলেন। দু'দিন পরে আপনিও উদরে অন্ন দিলেন। কিন্তু মুখে গ্রাস দিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল! হায়! আজ ভিক্ষার অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইল! না জানি স্বামী অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কতই কষ্ট ভোগ করিতেছেন!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—•••••—

তিন মাস পরে দেবেন্দ্রনাথ পত্র লিখিলেন ও দশটী টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—বাঙ্গালীর চাকরী ভিন্ন গতি নাই ; আমি চাকরী পাইলাম। বড় ছোট চাকরী ; কিন্তু কাজ বড় উঁচু। পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারীর জনৈক ধনবান্ শিষ্য এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অশিক্ষিত শ্রমিকের দেশে একটী অতিথিশালা বা অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত রুগ্ন বৃদ্ধ, বালক, শিশু, স্ত্রী যাহারা খাটিতে না পারিয়া অন্নকষ্ট পায় তাহারা এখানে আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায়, রোগে ঔষধ পায়। ব্রহ্মচারীর অনুরোধে আমাকে তাহাতে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। এ কাজে আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি। পরের ধনে অনেক অনাহারী পীড়িতের সেবা করিয়া প্রাণে বড় আহ্লাদ হয়। আমি কুলিবালক ও রমণীদিগকে লেখাপড়া শিখাই। বিশেষতঃ যিনি আমার প্রভু, তাঁহার প্রভুত্বে, স্বভাব-স্বাধীন বন্য পশু থাকিলেও যেন অশান্তি বোধ করিতে পারে না। আমি প্রভু কি তিনি প্রভু, সকল সময়ে তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার এই বিশ্বজন-সেবা কার্য্যে তিনি যে শুধু আমাকেই নিয়োগ করিয়াছেন তাহা নয় ; তিনি নিজে অহর্নিশ পরিশ্রমেও কাতর নন্। আমি সহকারী মাত্র। যাহা হউক আমি তোমাকে দশটি টাকার অধিক দিতে পারিব না। ভগবানের উপর মতি রাখিয়া সর্ব্বদা সাবধানে সংসার চালাইবে। মায়ের যেন কোন কষ্ট না হয় ইত্যাদি”—

কমলা আশ্বস্তা হইলেন। দশ টাকা পাইলে তিনি অনায়াসে সংসার চালাইতে পারিবেন। তাঁহার "সব্‌জি বাগে" ফল ধরিয়াছে, তরকারী কিনিতে হয় না, বরং বাজারে পাঠাইলে কিছু আয়ও হইতে পারে। প্রজারা মাছ দুধ এখনও মাঝে মাঝে দেয়।

ফুল ছোট ভাই সুরেনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, শশাঙ্কের দোকানের ধার কতক শোধ করিয়া আসিল। শশাঙ্কের মা তাহাদিগকে দুইটী আতা খাইতে দিয়া আরও দুইটী বাড়ী লইয়া আসিবার জন্য দিলেন। শশাঙ্ক বলিল, "তুমি নাকি ভাল পাখা প্রস্তুত করিতে পার, আমায় একখানি দিও ত। যেরূপ সূতা লাগ্‌বে আমায় ব'ল, আমি পাঠিয়ে দেব।

বামাদেবী খবর লইতে আসিলে কমলা সমস্ত তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। কথাবার্ত্তার পর কমলা বামা ঠাকুরাণীকে বলিলেন, "মা! পুরুষেরা এত কষ্ট করিয়া সংসারে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করেন, স্ত্রীলোকে ত কিছুই করে না। স্ত্রীলোকের কি কোনই শক্তি নাই?"

বামা। থাক্‌বে না কেন মা? ইচ্ছা থাক্‌লে স্ত্রীলোকে অনেক পারে। তবে যে পারে না সে অনেকটা পুরুষদিগের দোষেই। পুরুষেরা মেয়েদিগকে কেবল খেলার পুতুলটী করে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছে; স্ত্রীলোকেরা কিসে ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখ্‌বে, কিসে তারা সংসারের জ্ঞান বুদ্ধি পাবে, সে বিষয়ে পুরুষদিগের কিছুমাত্রও মনোযোগ নাই। বরং গরীব চাষাদের মেয়েরা অনেক কাজ করে, তারা সংসারের অনেক জানে শুনে। তারা কেমন সুস্থ; সুতরাং সুস্থ ও সবল সন্তান প্রসব করে। আতর গোলাপ মেখে, সরু সাড়ী প'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাক্‌লে কি হয় জান?—মনও খারাপ হয়, শরীর ও খারাপ হয়। ব্রহ্মচারী বলেছেন, বাঙ্গালা দেশের আধখানা ডুবে আছে। স্ত্রীলোক সংসারের আধখানা। একেবারে ডোবা।

কমলা। এখন ত মেয়েরা স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান্ হচ্ছে।

বামা। ছাই হচ্ছে। বিদ্বান্ হচ্ছে না বিবি হচ্ছে? বিলাসিতার সীমা পর্য্যন্ত শিখে ফেল্‌ছে! বরং ঘরে ব'সে, ঘর নিকিয়ে, বাসন মেজে, যেটুকু সুস্থ সবল ছিল, খোলা বাতাসে স্বাধীন ভাবে বেড়ায়ে আরও দুর্ব্বল হচ্ছে। জান না মা! এই যে ইংরেজী ধরণে লেখাপড়া শিখা, এতে ছেলেগুলি রক্ত মাংস শুকিয়ে মর্কট্ হয়ে পড়্‌ছে; আর মেয়েরা তাই শিখে স্বাধীন হবে, আর সুস্থ হবে! স্ত্রীলোক মায়ের জাতি, ভগিনীর জাতি; তাদিগকে রাক্ষসী-ভাষায় দোকানদারী রীতিতে শিক্ষা দিলে কি সুফল হয়? স্ত্রীহৃদয়ে চাই ভালবাসা, চাই প্রীতি করুণা। স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম সতীত্বের উপর অটল আস্থা। স্ত্রীহৃদয়ে চাই,—স্বদেশ, স্বজাতি, সবান্ধবের সুখের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জনের অটল আকাঙ্ক্ষা; রমণীর ধর্ম্ম, পুরুষকে কর্ম্মে উত্তেজিত কর্‌বে, স্বামী পুত্রকে বিলাসের অধঃপতন হ'তে সাবধানে সরাইয়া আনিবে। যে বিদ্যায় এমন শিক্ষা পাওয়া যায়, তাই স্ত্রীশিক্ষা। সে শিক্ষা পাইয়াছিলেন সীতা, দময়ন্তী, শৈব্যা। সেই শিক্ষার বলে তাঁরা রাজরাণী হইয়া পরে পথের ভিখারিণী —পরের দাসী হইয়াও তাঁহারা অচল অটল ভাবে স্বামীর কর্ত্তব্যপথের অনুসঙ্গিনী ছিলেন। তপোবনে বল্কল পরিয়া শকুন্তলা সে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাই প্রিয়তম কর্ত্তৃক মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা উপেক্ষা সহ্য করিয়াও নিরাশপ্রাণে কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দেন নাই! এ শিক্ষা আর্য্যের তপোবনে ছিল; বিলাস-সাজ-সজ্জা-সজ্জিত ইংরেজের স্কুল কলেজে তাহা থাকিতে পারে না। এশিক্ষা আছে আর্য্য দর্শন পুরাণে, ম্লেচ্ছের শাস্ত্রে তাহা নাই। গুরুদেব বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল পরাধীন এ আর্য্য দেশে যেটুকু আর্য্যভাব এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা রমণী সমাজেই আছে। কিন্তু আজ কাল বিকৃত শিক্ষায় তাহাও লোপ হইতেছে। যে কুলে রমণীগণ আতর

গোলাপ মাখিয়া, গাউন আঁটিয়া পিয়ান বাজাইয়া দিন কাটাইবে; যাহাদের শিক্ষার ফল দুই একটী কবিতা বা দুই একখানা উপন্যাস পাঠেই শেষ হইবে, সে কুলে কি আর সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রার জন্ম হওয়া সম্ভব? না সে জননীদিগের গর্ভে অর্জ্জুন, অভিমন্যু, রাম জন্ম গ্রহণ করিতে পারে?

কমলা বামা ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বামাদেবী কি এত বিদ্যাবতী? এ ত নিরক্ষর বঙ্গ রমণীর কথা নহে, পরম পাণ্ডিত্যের কথা! কমলা বলিলেন, তোমার এত জ্ঞান আছে তা ত জানিতাম না।"

হাসিয়া বামা ঠাকুরাণী বলিলেন, "যিনি আমার গুরুদেব, তিনি জ্ঞানের সাগর' আমার পিতাও ঐ গুরুর শিষ্য ছিলেন। আমি বালিকা বয়স হইতে পিতার ও গুরুদেবের শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি, এইরূপ গুরুর শিক্ষা পাইলে বাঙ্গালী মেয়েদিগের শিক্ষায় কাজ হইতে পারে। গুরুদেব বলিয়াছেন, রাজপুরুষেরা পুরুষদিগের শিক্ষার আইন করিয়াছেন,—তাহাদের শিক্ষার সাহায্যও করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ আছে। সমস্ত ভারতবাসীকে তাহাদিগের জাতির ধরণে শিক্ষিত করে, ভারতবাসীর মন হইতে আর্য্যগৌরব আর্য্যভাব লোপ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সে শিক্ষা না করিলে পুরুষদিগের রাজকার্য্য মিলে না, সুতরাং পুরুষেরা অগত্যা সেই ভাবেই শিক্ষা করেন। আর্য্যনারীদিগকে সে ভাবে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যক কি? যদি অন্দর বাহির সর্ব্বদিক হইতেই আর্য্য ভাব লুপ্ত হয়, তবে সে পবিত্র জাতির চিহ্নও থাকিবে না। গুরুদেব আসিলে তুমি এ বিষয় ভালরূপ বুঝিয়া লইও।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

যেরূপ আশা করা গিয়াছিল, তাহা ঘটিল না, ভূমি লক্ষ্মী বিরূপা হইলেন; চারি আনা রকম ফসলও জন্মিল না। তবে পাটের দাম কিছু বাড়িল, বিগত ঝড়ে পাট অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তবু পাট বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা কথঞ্চিৎ দাঁড়াইল। কৃষকেরা যে টাকা ধার লইয়াছিল, তাহার কপর্দ্দকও শোধ করিতে পারিল না। কমলা আশা করিয়াছিলেন, প্রজারা টাকা দিলে দুর্দ্দশা ঘুচিবে, দেবেন্দ্রনাথকে আর বিদেশে থাকিতে হইবে না। কিন্তু সে আশা বিফল হইয়া গেল, অধিকন্তু দেশে দুর্ম্মূল্য আরও বাড়িল।

এদিকে ফুলরাণীর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর পার হইয়া যায়। আর ত তাকে অবিবাহিতা রাখা যায় না।

কমলার বালিকা বয়সের একজন সখী ছিলেন। তিনি বড় ঢাকুরের গৃহিণী। তাহার যখন ছেলে হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "কমল! তোমার মেয়ে হলে আমার ছেলেকে বিয়ে দিতে হবে।"

ফুল যখন জন্মিয়াছিল, তখন কমলা লিখিয়াছিলেন, "ভাই আমার কন্যা হইয়াছে।" সখীও উত্তর দিয়াছিলেন "আমারও চুক্তি ঠিক আছে! আজ হতে তোমায় "বেহান" বলিয়া ডাকিব।"

কমলা সেই আশ্বাসেই দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, ফুলের বিবাহের জন্য তাঁহার কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। সেইরূপ আশ্বাসেই

কমলা সখীর কাছে জানাইলেন, "আমার ফুল ত্রয়োদশ বৎসরে পড়িয়াছে। আর তাহাকে অবিবাহিতা রাখা যায় না। আজ কাল আমার অবস্থা বোধ হয় জান; কিন্তু মেয়েত আর অবিবাহিতা রাখা যায় না। তোমার স্বামীকে বলিয়া অনেক দিনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া আমার জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিবে।"

সখী কমলার অবস্থার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার ছেলেও পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে; চারিদিক হইতে রজত কাঞ্চনের ফর্দ্দ লইয়া লোক আনাগোনা করিতেছে। কমলার পত্রের কি উত্তর দিবেন! দুই মাসের মধ্যে কোনও উত্তর আসিল না। কমলার বুঝিতে বাকি রহিল না, তবু আবার তাগিদ দিলেন। অগত্যা উত্তর আসিল, "বড় দুঃখিত হইলাম, তোমার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমার স্বামীর একজন বন্ধুর অনুরোধে ছেলের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। তোমার অবস্থার বিপর্য্যয় জানিয়া বিশেষ দুঃখিত আছি। আমার অবস্থাও ভাল নয়; খরচে আর কুলায় না।"

কমলা এইরূপ উত্তরেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং অধিক আর কি দুঃখিত হইবেন? মনে ভাবিলেন যাহার কেহ নাই, তাহার ভগবান্ আছেন।

বামা ঠাকুরাণী আসিয়া কহিলেন "আজ কদিন তোমার এমন কাল মুখ দেখি কেন? তোমার মনে কি কোন দুশ্চিন্তা এসে পড়েছে?"

কমলা। দুশ্চিন্তা আসে না? আমার তের বছরের মেয়ে আইবুড় ঘরে।

বামা। তাতে আর চিন্তা কি, তের বছর গেলেই কি বিয়ের বয়স গেল?

কমলা। ওমা! বল কি? হিন্দুর ঘরে তের বৎসরের মেয়ে আইবুড়, নয় বৎসরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে শাস্ত্র!

বামা। শাস্ত্র মিথ্যা নয় মা! কিন্তু সে শাস্ত্র এখন আর খাটে না। নয় বৎসরে যখন বিবাহ দেওয়া হইত, তখন দেশে স্ত্রী শিক্ষার এতটা অনাদর ছিল না। শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া, বধূ শাশুড়ী ননদীর কাছে দাসীর ন্যায় অনাদৃতা থাকিয়া কেবল গৃহ কার্য্যেই নিযুক্ত হইত না। তখন বালিকারা শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে স্নেহ পাইত, শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারিত; স্বামীও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত থাকিতেন, সুতরাং পত্নীকে ইচ্ছামত শিক্ষিত করিয়া লইতেন। এখন সেরূপ করিলে আর চলে না। গুরুদেব বলেছেন, এখন ষোল বৎসরের কমে মেয়েদের বিবাহ না দেওয়াই ভাল। তিনি বলেন, আগে পিতা মাতার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, সুতরাং তাঁহাদের সন্তানদিগরও স্বাস্থ্য ভাল থাকিত। আগে বালিকারা নয় বৎসরে যেরূপ বাড়িয়া উঠিত, এখন দুর্ব্বল পিতা মাতার সন্তান বালিকারা পনর বৎসরেও সেরূপ বাড়ে না। এখন পনর ষোল বৎসর মেয়েরা আইবুড় থাকিলে দোষ নাই। তবে মেয়ে যদি খুব বাড়িতে থাকে, তবে তাকে খুব ব্রহ্ম-চর্য্যের শাসনে রাখিতে হইবে।

[illegible] সে কিরূপ মা?

[illegible] আর বিধবা যুবতী দুইই এক। [illegible] যুবতীকেও

তেমনি [illegible]

হয় এক সন্ধ্যা নিরামিষ ভোজ[illegible]

কাছে তাকে যেতে দিতে হয় না। কখনও তাকে [illegible] থাক্‌তে দিতে নাই। সর্ব্বদাই তাকে সাধু কথা, উপখ্যান ব'লে শাস্ত্র শিক্ষা দিতে হয়।

কমলা। আজ কাল অনেকে সাহেবদের অনুকরণে ত্রিশ বৎসরেরও মেয়েদের বিয়ে দেয় না; তুমি যে এক দিন তাদের ভারি নিন্দা করেছিলে!

বামা। তা কর্‌বো না? তুমি কথাটা বোঝ নাই। ঐ যে এক দল লোক ত্রিশ বৎসরের মেয়ে আইবুড় রাখে,—তারা কেমনভাবে রাখে জান? মেয়েরা কত রং করা জামা, কাঁচলি গায়ে প'রে, মিহি সাড়ী বা গাউন পরিয়া বিবি সাজে। সাবানে অঙ্গ সাফ্ করে, আতর মাখে, আল্‌তা পরে, পাউডার মাখিয়া অঙ্গরাগ করে, সুগন্ধি তৈলে কেশ বিনাইয়া ফুলের থোপা গোঁজে! মাছ মাংস খায়; পেয়াজ রসুনে তাদের আপত্তি নাই! যুবকদের সঙ্গে এক সঙ্গে বেড়ায়, গান গায়, গল্প করে। মা! এমন আহার বিহারে এই গরম দেশে লক্ষ্মীরা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করেন,—তাঁরা দেবতা নাকি?

কমলা বামার কথা বুঝিলেন। সেই দিন তিনি কন্যাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত করিলেন। স্বামীকে বামাঠাকুরাণীর কথাগুলি সমস্ত জানাইয়া লিখিলেন, "এবিষয়ে তুমি ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাইলে উপদেশ লইবে।"

কন্যার বিবাহচিন্তা এইরূপে বামা ঠাকুরাণী কমলার অন্তর হইতে সরাইয়া দিলেন। আর একদিন বামা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি যেন কন্যা অবিবাহিতা রাখিলাম; কিন্তু এত বড় মেয়ে হিন্দুর ঘরে কে বিবাহ করিতে চাহিবে?" বামা বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল।" বামা যে সে ব্রাহ্মণী নন্; তাঁহার কথা ব্যর্থ হইতে পারে না! সুতরাং কমলা কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন.

কিন্তু এদিকে আর এক বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা দীনময়ী নিতান্ত পীড়িতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবন আর অধিককাল

স্থায়ী নয়, দেখিয়া কমলা স্বামী ও পুত্রকে সংবাদ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাড়ীতে আসিলেন। ভাগ্যবতী বৃদ্ধা পুত্র ও পৌত্রের মুখের দিকে চাহিয়া, পুত্রবধূর কোমল হস্ত বক্ষে ধরিয়া চক্ষু স্থির করিলেন। বালিকার ন্যায় কমলা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন।

কমলা শীঘ্র শাশুড়ীর শোক ভুলিতে পারিলেন না। কমলার পিতা মাতা কেহ নাই; তাঁহাদের কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভ্রাতারা আছেন; কিন্তু সকলেই পৃথক অন্নে, স্ব স্ব চাকরী স্থলে! কমলা সাজার ভগিনী, কাজেই আদর করিবার তাঁহার পিতৃপুরীতে আর কেহই নাই। এক দুঃখে অনেক দুঃখের কথা মনে আসিল; পিতা মাতার কথা মনে আসিল, ভ্রাতাদিগের নির্ম্মমতার কথা মনে হইল, জন্মভূমির কথা মনে হইল! বাল্যকালের কত সহচর সহচরীর কথা মনে আসিল! কমলা ভাবিলেন, আমার সব গিয়াছিল, কিন্তু মায়ের চেয়ে স্নেহময়ী শাশুড়ী ছিলেন। যাঁহার স্নেহের মহিমায়, মাতা পিতা জন্মভূমি সকলই ভুলিয়াছিলাম! সহস্র দুঃখ যন্ত্রণায়ও যাঁহার একবার মাত্র স্নেহের "বউমা" সম্বোধনে আমার প্রাণে সুধা ঢালিয়া দিত; এই বয়সেও আমি যাঁ'র [illegible] শীতল কোলে [illegible]ম, আমার জগৎ [illegible] কত কথা মনে পড়িল! যে দিন [illegible]নে শ্বশ্রূঠাকুরাণী কমলাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, "মা তুমিই আমার ঘরের লক্ষ্মী", সেই দিন হইতে বিশ বৎসরের কত কথা মনে পড়িল। নূতন নূতন অল্প দিন মাত্র শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া কমলা পিত্রালয়ে যাইতেন; যাইবার কালে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চক্ষু দিয়া ধারা বহিত; কমলারও কান্না আসিত। পিত্রালয় হইতে

শ্বশুরবাড়ী আসিলে মাতা পিতার বিচ্ছেদে বধূর মুখ মলিন থাকিত; শ্বশ্রূঠাকুরাণী কত স্নেহে কোলে তুলিয়া বলিতেন, "আমিই তোমার মা!" একবার কমলা কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন; যাইবার কালে ঠাকুরাণী বড় কাঁদিয়াছিলেন; কমলা কলিকাতা দেখিবার আনন্দে ও স্বামি-সঙ্গে বাস করিবার আশায় তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু কলিকাতায় কিছুদিন থাকিয়া তাঁহার আর ভাল লাগিল না। শাশুড়ীর কাছে পত্র লিখিলেন, তিনি দেবেনকে সংবাদ করিয়া বউকে বাড়ী আনিলেন। এমন শাশুড়ীর কথা কি সহজে ভোলা যায়?

নিঃস্ব দেবেন্দ্রনাথ মাতৃদায়ে পড়িয়া বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর সন্তান অবশ্য কিছু করিতে হয়। দেবেন্দ্রনাথ ধার করিয়া সামাজিকবর্গকে ছোট খাট যাহা হয় একটা ভোজ দিবেন ভাবিলেন। কিন্তু গ্রামে কাণাকাণি হইতে লাগিল, "দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছে; ষোল বছরের মেয়ে আইবুড় ওর ঘরে; ওর ঘরে কে খাইবে?"

বামা দেবী শুনিয়া বলিলেন, "তুমি ধার করিয়া এখন [illegible] যেও না। আজ কাল তোমার অবস্থা ভাল নয়, সামাজিকেরা একটা গণ্ডগোল করিবে। তোমার অবস্থা যখন ভাল হইবে, তখন তুমি ২০ বছরের মেয়ের বিয়ে দিও, সেই ভোজেই সামাজিক দিগকে আমি এনে দেব।"

দেবেন্দ্রনাথ তাহাই করিলেন। গঙ্গাতীরে মায়ের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

বৈশাখের অপরাহ্ণ বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। সমস্ত দিনের শ্রমের পর সূর্য্যদেব শ্রান্ত শান্তভাবে বৃক্ষ পল্লব স্বর্ণ ভূষায় সাজাইয়া, গ্রাম্য সরোবরের বক্ষে হীরক-হার পরাইয়া দিয়া যেন একটু আয়াস করিতেছেন। অদূরবর্ত্তী প্রান্তরবাহী নির্ব্বিরোধ বায়ুপ্রবাহ পল্লীর বৃক্ষ লতা দোলাইয়া, সরোবরবক্ষ কাঁপাইয়া, নিবিড় অশ্বত্থচ্ছায়ে রাখাল বালকদিগকে স্নিগ্ধস্পর্শে পুলকিত করিয়া বড় সুন্দর বহিতেছে! ফুলরাণী শিশু ভ্রাতার সঙ্গে মাতার সব্জী-বাগানে জল দিতেছে! পার্শ্বে ফলভরা আমের গাছে পাখী ডাকিতেছে "বউ কথা কও", শিশু সুরেন্দ্রনাথ পাখীকে ব্যঙ্গ করিতেছে, "বউ কথা কও"। অকস্মাৎ বামা [illegible] উঠিলেন, "যেন শকুন্তলা [illegible] কথা [illegible] দেবীর নিষেধে কমলা কন্যাকে কোন প্রেম-কাহিনী শুনিতে দেন নাই।

ফুলরাণী জিজ্ঞাসিল, "শকুন্তলা আবার কে?"

বামা ঠাকুরাণী শকুন্তলার গল্প বলিলেন। শুনিয়া ফুলরাণী বলিল, রাজার ত বড় অন্যায়।"

বামা দেবী বলিলেন, তোমার মা বাবার কি অন্যায় ? তোমায় এই কুমড়া গাছ আর ফুটী গাছে জল দিতে দিয়েছে ? এযে যুঁই মল্লিকা সেবার বয়স !

কমলা বামা দেবীকে মা বলিয়াছেন ; ফুলের তিনি দিদি মা। নাতিনীর সঙ্গে আজ তিনি বড় রসিকতা আরম্ভ করিলেন। বামা ঠাকুরাণী স্বভাবতঃই একটু রঙ্গপ্রিয়া ছিলেন। পাঁচ বৎসরের শিশু হইতে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তিনি সকলের সঙ্গেই পর্য্যায়ানু-সারে রঙ্গ করিতে ক্রটী করিতেন না। তাহাতে যেন তাঁহার বড় আনন্দ হইত। কিন্তু বামা দেবী কোনও বিধবা যুবতীর সহিত হাসিয়া কথা বলিতেন না !

দুই একবার ব্যঙ্গে ফুল কোনও কথা বলিল না, অল্প হাসিয়া মুখ নীচু করিল মাত্র। বামা দেবী তবু ছাড়িলেন না। আবার বলিলেন, "বলত ফুল ! ফুল ফোটে কেন ?"

ফুল মাথা নীচু করিয়াই বলিল, "কি জানি, আপনার কথা আমি বুঝি না।"

হাসিয়া বামা দেবী বলিলেন, "আর বুঝবে ? এই বুড়ি হতে চল্লে, তবু ত কেউ বুঝালে না।"

ফুল একটী গাছের ডগা ধরিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। বামা দেবী আবার বলিলেন, "দেখ ফুল ! তোর বয়সী সকলেরই ত বিয়ে হয়ে গেল, তোর বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না ?"

"কি জ্বালা ! আমার গাছে জল দেওয়া হ'ল না, আপনি চলে যান।" বলিয়া ফুল কলসী তুলিয়া লইল। সে মনে মনে ভাবিল, দিদি মা আজ এমন কথা বলেন কেন ? এমন কথা ত তিনি কখনও বলেন না।

বামা ঠাকুরাণী এবার হাসির ভাব লুকাইয়া, বেশ গম্ভীর হইয়া ফুলের হস্তখানি ধরিয়া বলিলেন, "দেখ্ ফুল! একটী কথা তোকে জিজ্ঞেস কচ্ছি, যথার্থ উত্তর দিবি। ও পাড়ার শশাঙ্ক দত্ত তোকে বিয়ে কর্ত্তে চায়, তাকে পছন্দ হয় ?"

ফুল লজ্জায় যেন ছোট হইয়া গেল। বামা ঠাকুরাণীর হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "আপনি মার কাছে যান, আমি কাজ করি।"

বামা দেবী ফুলকে ছাড়িলেন না। তাহাকে ঘাসের উপর বসাইয়া আপনিও বসিলেন। তারপর বাস্তবিক জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় নিতান্ত সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহের কণ্ঠে বলিলেন "শোন দিদি! আমি তোমায় তামাসা কচ্ছি না। আমার কাছে মনের ভাব বল্‌তে লজ্জা করো না। দেখ হিন্দুর ঘরের মেয়ে তুমি, তোমার এই ষোল বৎসর বয়স এখন তোমাকে বিয়ে না দেওয়া ভাল দেখায় না। তোমার বাবার অবস্থা এতদিন ভাল ছিল না, তাই এত কাল তোমার বিয়ের [illegible] পারেন নাই। এখনও যে অবস্থা খুব ভাল হয়েছে [illegible] শশাঙ্ক দত্তের সঙ্গে [illegible] আছে ? [illegible] চ্ছা করিলে কথার বলেই মানুষ [illegible] ন্তরের ভাব জানিয়া লইতে পারেন। ফুলরাণী লজ্জার ভাব ভু[illegible]। বলিল, "এ কথা আমার কাছে কেন ?"

বামা। তোমার মনের ভাব জান্‌তে হয় বৈ কি ? তুমি এখন বয়স্থা, তোমার অনিচ্ছায় বিবাহ দিলে তুমি অসুখী হ'তে পার। তুমি আরও পাঁচ বৎসর অবিবাহিতা থাক, তবু তোমার মা বাবা তোমাকে, তোমার

পছন্দ না হয় এমন বরে বিয়ে দেবেন না। শশাঙ্ক ছেলেটী মন্দ নয়, তবে গরীব।

ফুল। গরীব কেন ? আমাদের যেদিন খাবার ছিল না, সেদিন তিনি আমাদের চাল দিয়েছিলেন।

বামা। সে ওর মনটা ভাল। অবস্থা তেমন কিছুই নয়। গরীবের মত খেটে খায়, দোকানদারী করে, মোটা কাপড় পরে ; বাড়ীতে ছোট ছোট চালা ঘর।

ফুল। আমরা কি খুব বড় মানুষ ?

বামা। তোমার সঙ্গে এক বড় মানুষের ছেলের সঙ্গেও বিয়ের কথা হচ্ছে ?—কুসুমপুরের তালুকদারের ঘরে, ছেলে কলেজে পড়্ছে।

ফুল। গরীবের মেয়ের গরীবের ঘরে যাওয়াই ভাল।

বামাদেবীর আর বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন। একদিন শশাঙ্কের ব্যাঘ্র শীকারের কথা ফুল মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিল, যেন তাহাতে বড় মুগ্ধ হইয়াছিল। সেই দিন বামাদেবী যাহা ভাবিয়াছিলেন, আজ তাহা নিশ্চিত সত্য বলিয়া বুঝিলেন ; তাঁহার মুখ আনন্দোৎফুল্ল হইল। তিনি বুঝিলেন, এ ফুল শশাঙ্কের উদ্যানে ভালই শোভা পাইবে। বামাঠাকুরাণী নীরবে ফুলরাণীর ফুটন্ত মল্লিকার মতন মুখখানি দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছিলেন।

ফুলরাণী বলিল, "দিদিমা! শুন্‌লাম, ওপাড়ার দিগম্বরী কলেরায় মারা গেছে, তাকে শশ্মানে নিতে লোক মিলে নাই।"

বামাদেবী বুঝিলেন, শশাঙ্কের গুণের ব্যাখ্যা শুনিতে ফুলের প্রাণ উৎসুক হইয়াছে। দিগম্বরীর মরণে শশাঙ্কের বীরত্ব ও মহত্বের কথা গ্রাম-ময় রাষ্ট্র হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "দিগম্বরী অনাথা, যৌবনে দুশ্চরি-ত্রাও ছিল। সংসারে তাহার কেহ ছিল না, কাহাকেও সে আপন

করিয়া লইতে পারে নাই। যখন গ্রামময় কলেরা, তাহাকেও ঐ রোগে ধরিল। গ্রামের লোক ভয়ে গ্রামের বাহির হয় না। অনাথা কুলনাশিনী দিগম্বরীকে দেখিতে কে যায়। শশাঙ্কের তখন অন্য কাজ নাই,—কলেরা রোগীর সেবা করা, ডাক্তার ডাকা, মৃতের সৎকার করা, এসব কাজে তার খাবার অবসরও হ'ত না। দিগম্বরীর কেউ নাই, সুতরাং শশাঙ্ক তাহারই হইল। ঔষধ করিল, সেবা করিল, বাতাস করিল, সমস্ত রাত্রি একাকী ব'সে দিগম্বরীকে বাঁচাইবার জন্য অনেক করিল। অভাগিনী বাঁচিল না। শেষ রাত্রে মারা গেল। শশাঙ্ক একাকী মড়া ল'য়ে ব'সে রহিল। প্রভাতে লোক ডাকিল, কেহ আসিল না। কাজেই একাকী ব'য়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে এল। যেমন সাহস, গায়ে বলও তেমনি।

ফুল। বাবা! এ যে ডাকাত!

বামাদেবী বুঝিলেন, বালিকার কথাটী বড় আন্তরিক! এ শুধু [illegible] কথাটীর দ্বারা বীরপ্রিয়া বালিকা অন্তরের [illegible] দেবী আবার রঙ্গ [illegible]

[illegible] কাজ নাই।"

দিদিমার হাসি মুখ দেখিয়াই ফুল বুঝিয়াছে, এটা ব্যঙ্গ। তাহার মনে আবার লজ্জা আসিয়া ভর করিল। কোনও কথা বলিল না। বামা বলিলেন, "ফুল, তুমি ফুল্লরা কালকেতুর গল্প শুনেছ?"

ফুল। হ্যাঁ, সেই ব্যাধের কথা? শুনেছি!"

বামা। আজ থেকে আমি আমাদের ফুলের নাম "ফুল্লরা" রাখ্‌লেম; কেমন মিন্‌সের শীকারের মাংস নিয়ে বাজারে বেচ্‌তে পার্‌বি ত?

ফুল। তা নয় বেচ্‌লাম্, দু'দিন পরে সাত ঘড়া মোহর পাব ত।

অতঃপর বামাঠাকুরাণী দেবেন্দ্রনাথ ও কমলাকে গিয়া বলিলেন, শশাঙ্কের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে।

তাঁহারা শশাঙ্ককে জানিতেন, একদিন তাহারই প্রদত্ত অন্নে কমলার পুত্র কন্যার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কমলা পরমানন্দে সম্মত হইলেন। বলিলেন, শশাঙ্ক কি সম্মত হবেন?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, শশাঙ্ককে লোকে সমাজচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র কচ্ছে! সে দিগম্বরীর সৎকার করেছে। দিগম্বরীর ঘৃণিত রোগ ছিল, তার নাকি প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। আরও সে অস্পৃশ্য জাতির ছোঁয়া জল খায়, ভদ্র জাতির মান রাখে না।"

বামা। তুমিও ত সমাজচ্যুত। তোমার ঘরে ষোল বছরে মেয়ে আইবুড়। বেশ হবে, জামাই শ্বশুরে এক দলে থাকবে।"

তারপর বামাঠাকুরাণী গিয়া শশাঙ্ককে ধরিলেন। তিনি যে ফুলকে বলিয়াছিলেন, "শশাঙ্ক তোমাকে বিয়ে কর্ত্তে চায়", সেটী মিথ্যা কথা। শশাঙ্ককে বামাদেবী জোর করিয়া বলিলেন, "এই মেয়ে তোমায় বিয়ে কর্ত্তেই হবে।"

শশাঙ্ক বলিল, "দেবেনবাবু বড় মানুষ; এ গ্রামে তাঁর জ্ঞায় কুলে শীলে কেহ নয়। মাঝে দিনকতক মন্দ অবস্থা হয়েছিল, এখন আবার তাঁ'র সুসময়। বরাবর তাঁ'র ছেলে মেয়ে বড় মানুষের ভাবে প্রতি-পালিত। আমার ঘরে এসে তার কি সুখ হবে?"

বামাঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "সে যা হয় হবে! তুমি কালকেতু ব্যাধ আর ফুলরাণী ফুল্লরা। হরিণের মাংস রাঁধ্‌তে খুব জানে।"
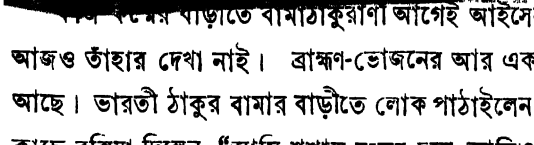
শশাঙ্কও হাসিয়া বলিল, "আমি যে সমাজে পতিত। দেবেনবাবু আমায় মেয়ে দেবেন?"

"আচ্ছা, এই ভট্টাচার্য্য বাড়ীর শ্রাদ্ধের মধ্যেই তার আমি একটা কিছু করব।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

—০ঃঃ*ঃঃ০—

রাধাকান্ত,—"ভারতী-ভট্টাচার্য্য" মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ—বড়ই সমারোহে! ভট্টাচার্য্য-বংশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর বংশের এক শাখা; তাই তাঁহাদের আখ্যা "ভারতী"। কুল গৌরবে রাধাকান্ত ভারতীর মস্তক সর্ব্বত্রই উন্নত! তিনি পাঁচ শত ঘর ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু; কিন্তু অধিকন্তু তিনটী ছেলে বড় চাকুরে। রাধা-কান্ত শর্ম্মার সমতুল্য কে? তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ, গ্রাম কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে।

শিষ্য-বাড়ী হইতে ভারে ভারে দ্রব্য সম্ভার আসিতেছে! "খাতক" দিগের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; এবার জানি প্রভু পিতৃশ্রাদ্ধের যৌতুক কতই দাবী করিয়া বসেন। কিন্তু মনের চিন্তা মনে রাখিয়া রাত্রি দিবা [illegible] মিষ্ট বলিয়াছেন, [illegible] আর তোমাদের [illegible] ণ হয় করিও।"

[illegible] বাড়ীতে বামাঠাকুরাণী আগেই আইসেন। কিন্তু এবাড়ী আজও তাঁহার দেখা নাই। ব্রাহ্মণ-ভোজনের আর এক দিন মাত্র মধ্যে আছে। ভারতী ঠাকুর বামার বাড়ীতে লোক পাঠাইলেন। বামা লোকের কাছে বলিয়া দিলেন, "আমি শশাঙ্ক দত্তের দলে, আমিও বাড়ী যাব না।"

শুনিয়া ভারতী শর্ম্মা ত তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন।—বটে, মেয়ে মানুষের এত গোস্তাকি? কিন্তু বামা না আসিলে রান্না বান্না কর্‌বে কে? ভারতী বাড়ীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক এ কাজে আসিতে সাহস করেন না। কারণ, ভারতী গৃহিণী রাঁধুনীদিগকে তেল ঘি মসলা

স্বাধীন ভাবে খরচ করিতে দিতে কিছুতেই রাজি নন। এবার আবার বামা ঠাকুরাণীর একটু বাতাসও আছে, সকলেই বলিয়াছে আমরা পারিব না। তার পর একজন অন্তরঙ্গ এসে খবর করিলেন, বামা বামণী দল পাকিয়ে বসেছেন ; পাড়ার ছেলে যুবকেরা অনেকেই আসিবে না। তারা বামা ঠাকুরাণীর চেলা। তাইত কাজ কর্ম্মের ছেলে ছোক্‌রা যে কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ভারতী ঠাকুরের ব্রহ্মতেজ বড় জ্বলিল ; কিন্তু কি করেন, নাচার। অগত্যা স্বয়ংই বামার বাড়ীতে গেলেন।

রাধাকান্ত শর্ম্মা বলিলেন, "বামা ? এ তোমার কেমন রীতি ? তুমি আমার বাড়ীতে এখনও গেলে না। আমি তোমার নামে এক জোড়া কাপড় ফর্দ্দেতে লিখেছি।"

বামা ঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "আমার ভাগ্যি আর কি ?

রাধা। তা দেখ, আমার এই দায়, তোমায় একটু আগে গিয়ে দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়।

বামা। আমি যে শশাঙ্ক দত্তের দলে গিয়াছি! আপনাকে ত বলে পাঠিয়েছি।

রাধা। সে কি ? তুমি বামনের মেয়ে, তুমি শশাঙ্ক দত্তের দলে, ব্যাপার কি ?

বামা। ব্যাপার আর কিছু নয়, আমায়ও ত মর্ত্তে হবে, টেনে ফেলবার লোক নাই। শশাঙ্ককে ছেড়ে দিয়ে, শেষে কি ঘরে পচ্‌ব ?

রাধা। তুমি বামুনী, তোমায় কি শশাঙ্ক সৎকার কর্‌বে ? এ কেমন কথা ? আমরা কি তোমায় পর ভাবি ?

বামা। কি জানি, যদি কলেরা বা বসন্ত হ'য়ে মরি, তবে কি আর কেউ আস্‌বে ?

মেয়ে মানুষের এতটা মুখরাপণায় রাধাকান্ত ঠাকুরের হাড় জ্বলিয়া

যাইতেছিল। কত আর সহ্য হয়? তিনি চো'ক গরম করিয়া বলিলেন. "তা হোক, এখন চল। তুমিও এমন হয়ে পড়েছ?"

বামা হাসিয়াই বলিলেন, "ঠাকুর, তোমার চো'ক গরমে কি কখনও ভয় করেছি?—আমি বল্‌ছি, শশাঙ্ককে না ডাক্‌লে আমি তোমার বাড়ী যাব না। আমায় যে ভালবাসে, তাকেও যেতে দেব না।

রাধা। বটে? তোমরা মেয়ে মানুষ, তোমাদের এতটা সামাজিকতার ভিতরে যাওয়া কেন? তোমরা সমাজ শাস্ত্রের কি জান?

বামা। তাই ত! স্ত্রীলোকগুলি সংসারেব দাসীবৃত্তি কর্‌তেই এসেছিল, দাসীবৃত্তি করেই যাবে আর কি? কেন স্ত্রীলোক কি সংসারের অর্দ্ধেক নয়, তোমরা তোমাদের সংসারের আধ্‌খানা এমন আঁধারে ঢেকে রাখ্‌তে চাও কেন? স্বীকার করি, পুরুষ বড়, স্ত্রী ছোট; পুরুষ শক্ত জাতি, মহা শক্তিশালী—স্ত্রী কোমল, পুরুষের অবলম্বন ব্যতীত শক্তিহীনা! তাই বলিয়া তাহারা সংসারের কেহ [illegible] কেন? স্ত্রীলোকের [illegible] চাও, ভগিনীর [illegible] ষয় হইতে প্রচ্ছন্ন [illegible]?

ভারতী শর্ম্মাত অবাক্। বলে কি?—সেই চিরকালেব বুনো মেয়ে বামা ব্রাহ্মণী আজ বলে কি? সেই ব্রহ্মচারী বেটাই এ মাগীকে এমন করে তুলেছে। গোঁসাই বলিলেন, "ওগো! তুমি বল্‌ছ কি? ভট্‌চায্যি হলে নাকি?"

বামা। শুন ঠাকুর, আরও কিছু বলিব। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এরূপ অবহেলা করেই, তোমরা গোল্লায় যাচ্ছ! আমার কথা ভাল হয় মন্দ হয়, শুনে বিচার কর। শোন, তোমরা বিদেশী—বিধর্ম্মীর শাস্ত্র শিখে স্বদেশী, স্বজাতিয় ভাবটা একবারে ভুলে যাচ্ছ। এরূপ না করলে

চলে না, রাজ সরকারে চাকরী যোটে না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে এমন করে রাখ কেন? তা'দিগকে স্বজাতির ধর্ম্ম, স্বজাতির শাস্ত্র শিখাও না কেন? বাহিরে তোমরা সাহেব হও, অন্দরে পবিত্র আর্য্য ভাবটা বজায় রাখ না কেন? স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়া শিখ্‌তে দাও,—তাদিগকে শাস্ত্র ধর্ম্ম বুঝ্‌তে দাও, সমাজে তাদের কিছু অধিকার দাও।

রাধা। যা'ক ওসব পরে শুন্‌ব। এখন তুমি চল।

বামা। আমি ত বলেছি, আমি যাব না। শশাঙ্কের ন্যায় সহৃদয় যুবকের প্রতি যে সমাজে অযথা অত্যাচার করে, আমি সে সমাজে নাই।

রাধা। শশাঙ্ক দত্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে তাঁ'কে সমাজে নেওয়া যেতে পারে!

বামা। প্রায়শিত্ত! শশাঙ্ক প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে?—না গ্রামের অন্য সমস্ত লোক প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে? গ্রামের ভিতর একটা মড়া পড়ে থাক্‌ত, তার দুর্গন্ধে গ্রামবাসী লোক উত্যক্ত হ'ত, হয়ত [illegible] সেই ভয়ঙ্কর ওলাওঠারোগে আরও কত লোক মারা যেত; শশাঙ্ক দত্ত তাই হতে দেয় নাই, আপনার জীবনের প্রতি মমতা না করে অনাথার সৎকার করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে? একটী অনাথা নিঃসহায় রোগ-যন্ত্রণায় পিপাসায় ছট্‌ফট কর্ত্তে ছিল, গ্রামের লোক প্রাণের ভয়ে তাকে একবিন্দু জল দেয় নাই; শশাঙ্ক তাহার সেবা করেছে, সেই প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে! আমি বলি গ্রামবাসী প্রায়শ্চিত্ত করুক। শশাঙ্কের কাছে সমস্ত গ্রামবাসী অপরাধী।

রাধাকান্ত ভারতী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোকের কথা এতটা কে সহ্য করিতে পারে? আচ্ছা থাক, দেখি তোমার অভাবে আমার বাবার শ্রাদ্ধ আটকায় কিনা! ভারতী গোঁসাই চলিয়া গেলেন।

বামাও তাঁহার দল পাকাইলেন। গ্রামের বালক যুবকদিগকে বলিলেন, তোমরা ভারতী বাড়ীর কোনও কাজ করিতে গেলে আমার অপমান হইবে। তাহাদের কাছে বামার কথা মাতৃ-আজ্ঞা! তরুণের দল বামা ঠাকুরমার মুখের কথা বেদবাক্য বলিয়া মানে। সকলেই দল পাকাইয়া বসিল; কিছুতেই গোঁসাই বাড়ী যাইব না। বামার গাভীর দুধ খাইয়া যে মাতার ছেলে বাঁচিয়াছে, তিনি বলিলেন, "বামা যাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবে, এমন কাজ আমা হইতে হইবে না।" যাঁহার মরণাপন্ন পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বামা পনর দিন আহার নিদ্রা অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া পুত্রের জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহারও সেই কথা,—বামার কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। কোনও না কোনও প্রকারে বামার সঙ্গে সদ্ভাব নাই, এমন লোক গ্রামে বড় অল্প! ভারতী ভট্টাচার্য্য বড়ই বিপদে পড়িলেন। জিনিস পত্র সংগ্রহ করা হইতেছে, কিন্তু তাহা বন্দোবস্ত করিবার লোক নাই। রান্না বান্না করিবার লোক নাই; পরিবেশন [illegible] পাচক ব্রাহ্মণের [illegible]

তখন অগত্যা গ্রামের সামাজিকবর্গ একত্র হইয়া [illegible] মাপ করাই সাব্যস্ত করিলেন! পল্লীবাসিনী নির্ব্বান্ধবা বিধবা ব্রাহ্মণীরই জয়লাভ হইল!

বঙ্গ-কুল-লক্ষ্মীগণ! এরূপ শক্তি-মূর্ত্তি তোমাদের মধ্যে কি আর আবির্ভূতা হইবে না? আবার কি তোমাদের সেবা সাধনায় জগৎ বশীভূত হইবে না? বঙ্গসংসারে তোমাদের ন্যায্য অধিকার তোমরা কি বুঝিয়া লইবে না?

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর পরে দেশের অবস্থা অনেকটা ফিরিয়াছে। পর বৎসর ভূমিদেবী কৃপা করিয়াছেন। বামাদেবী ও শশাঙ্কের পরামর্শ মত এবং শিক্ষিত কৃষক যুবক গণেশের নেতৃত্বে কৃষকেরা এবার চারি আনা রকম ক্ষেতে পাট বুনিয়াছিল, আর বার আনা রকম ক্ষেতে ধানের চাষ করিয়াছিল। বিশেষতঃ গণেশ নিজে কতকটা উচ্চ জমিতে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কিছু গম ও আলুর চাষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, এ দেশে এই খাদ্যশস্যও আশানুরূপ জন্মিতে পারে। অন্যান্য কৃষকেরা সেই দৃষ্টান্তে এবার উচ্চ ভূমিতে আলু পটল ও গমের চাষ আরম্ভ করিয়াছে। কৃষকেরা সেই ধারের টাকা অর্দ্ধেক শোধ করিতে পারিয়াছে। সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারীর আদেশে শশাঙ্ক সেই টাকা দিয়া একটী জাতীয় তহবিল স্থাপন করিয়াছে। বামাদেবী হইয়াছেন তাহার কোষাধ্যক্ষ। বামাদেবীর বাড়ীতে একটী নারীশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এদিকে গ্রামের বনিয়াদী অভিজাত সম্প্রদায় বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। নিতান্ত দরিদ্র যুবক দোকানদার শশাঙ্কের যশ প্রতিষ্ঠায় চারিদিক মুখরিত। উচ্ছন্ন বেপর্দ্দা একটা বেয়াদব বিধবা বামা বামনী,—তাহার মাতৃত্ব সেবা-শক্তিতে দেশ যেন তাহার পায়ে নুইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে কয়েকজন পাটের দালাল ছিল, তাহাদের ব্যবসায় পশার একবারে

লোপ হইয়া গিয়াছে। পাটের বাজারে এখন শশাঙ্কের ষোল আনা অধিকার। দালালেরা একবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। আর জন কয়েক ভদ্রবংশের অকর্ম্মা আড্ডাধারী যুবকও তাহাদের সকল রকম দুষ্কর্ম্মে শশাঙ্কের কাছে বাধা অপমান পাইয়া বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বনিয়াদী সমাজনেতাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হইল, সমাজ গেল, জাতি গেল, গণেশ নমঃশূদ্রের সঙ্গে বসিয়া ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ছেলেরা একত্র বসিয়া জলযোগ করিতেছে। কুল-ধর্ম্ম ত্যাগিনী বামা এই কার্য্যের পরামর্শদায়িনী। এদিকে দেবেন্দ্রদেবের লজ্জাশীলতাহীনা যুবতী স্ত্রী ষোল বৎসরের অনূঢ়া কন্যা লইয়া স্বচ্ছন্দে রাস্তায় চলে, চাষার মেয়েদের নিয়া বামার বাড়ীতে স্কুল বসাইয়া লেখা পড়া শিখায়, চরকা কাটে, কলে বসিয়া মেম সাহেবের মত জামা কাপড় সেলাই করে। এ সব দমন করিতে না পারিলে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত রসাতলে গেল, অভিজাত বনিয়াদী ঘরের মান সম্ভ্রম গেল। যেরূপেই হউক, ইহাদিগকে দমন করিতেই হইবে।

এই সময়ে বড় এক সাহেব পাটের দালাল হইয়া আসিলেন। তিনি একজন দেশীয় সহচরও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। এখানে আসিলে দেশীয় বহু দেশীয় দালাল তাঁহার সাহচর্য্য লইয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা, কৃষকদিগকে এই পত্তনের সময়েই টাকা দাদন দিবেন। তাহারা যত বিঘা জমিতে পাটের চাষ করিবে, তাহার বিঘা প্রতি অগ্রিম ২০৲ টাকা অগ্রিম দাদন দিতে প্রস্তুত। কৃষকেরা বলিল, তাহারা শশাঙ্ক বাবু এবং মা ঠাকুরাণী বামাদেবীর বিনা অনুমতিতে কোনও কাজই করিবে না।

এদিকে খৃষ্টান মিশনারীগণও বড় উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহারা কৃষকপল্লীতে প্রবেশ করিয়া উদার ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া পতিত পিছনে পড়া হিন্দুদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

শিক্ষিত কৃষক যুবক গণেশ তাঁহাদিগকে অনেক আশা দিয়াছিলেন। আবার সেই গণেশই তাহাদিগের ঘোরতর বিরোধী হইয়া, সমস্ত কৃষক সমাজ বিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই উপলক্ষে ফিরিঙ্গি পাটের ব্যবসায়ী ও খৃষ্টান মিশনারীদিগের সহযোগ হইল। তাঁহাদের সঙ্গে দেশীয় দালাল মহাজনেরাও যোগ দিলেন। অভিজাত কুলীন ভদ্র সম্প্রদায়ও ইহাদিগের সমর্থন করিলেন। এক সামান্য বিধবা রমণী বামা, শশাঙ্ক দত্ত আর দেবেন্দ্রদেবকে লইয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় বড় ঘরের সকলকেই অপদস্থ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে কিছুতেই চলিতে পারে না।

দেবেন্দ্রনাথ এখনও দূর দেশের সেই কর্ম্ম ছাড়িয়া ঘরে আসিতে পারেন নাই। তাহার সংসারে অনটন গিয়াছে, কিন্তু সেখানকার কর্ম্ম কর্ত্তা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না। দেবেন্দ্রনাথেরও তাহা ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছে না। সেখানে শত শত শ্রমিক নরনারী তাঁহার আজ্ঞাকরী শিষ্য। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিবার কথা বলিলে, তাহারা পা ধরিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ তাহাদের স্নেহের বন্ধন এড়াইয়া কিছুতেই স্ত্রীপুত্রের কাছে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেছেন না. কমলাও স্বামীকে এমন পবিত্র কর্ম্ম হইতে সরাইয়া আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন না। কন্যা ফুলরাণী ও কনিষ্ঠ পুত্র সুরেনকে লইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে গৃহবাস করিতেছেন, নরেন পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলে, দেবেন্দ্রনাথও আসিয়া শশাঙ্কের সঙ্গে ফুলরাণীর বিবাহ দিবেন। আগামী বৈশাখেই দিন স্থির হইয়াছে।

এমনি দিনে একদিন গণেশ মণ্ডলের বিধবা ভগিনী ও ফুলরাণী বামাদেবীর বাড়ীর পাঠশালা হইতে গৃহে ফিরিতেছিল। সহসা কতক-

গুলি গুণ্ডা আসিয়া তাহাদিগেকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়। তখনই সন্ধ্যাকাল, গ্রামময় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শশাঙ্ক তখন দোকানে কাজ করিতেছিল। বামাদেবী দ্রুতপদে গিয়া তাহাকে সংবাদটা দিলেন।

শুনিবামাত্র আহত সিংহের মত শশাঙ্ক লম্ফ দিয়া উঠিল। তখনই তীর ধনু ও বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া শশাঙ্ক ছুটিল। শশাঙ্ক ছিল বড় তীরন্দাজ সে তীর ছুঁড়িয়া ব্যাঘ্র শিকার করিতে পারিত।

শশাঙ্ক তীর বেগে ছুটিয়া, কোনও কিছু চিন্তা না করিয়া, প্রবল বেগবতী নদী সাঁতার কাটিয়া পার হইল। নদীর অপর পারে খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচার এক ইতর শ্রেণীর বাঙ্গালী সপরিবারে বাস করিত। তাহারই পার্শ্বে ফিরিঙ্গি পাট ব্যবসায়ীদিগের পাটের কারখানা। শশাঙ্ক নদী পার হইয়া উল্কার মত সেই দিকে ছুটিল। সেই দিক হইতে কয়েকজন লোক আসিতেছিল, মধ্য পথে শশাঙ্কের সঙ্গে তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। শশাঙ্ক তাহাদিগকে চিনিত, তাহারা সেই গ্রামেরই লোক, চুরি ডাকাতি, নারী-নির্য্যাতন প্রভৃতি তাহাদের নিত্য ধর্ম্ম। দশটী টাকা পাইলে তাহারা নরহত্যা, গৃহদাহ, নারী নিগ্রহ প্রভৃতি কোনও কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। শশাঙ্ক বুঝিল ঐ ফিরিঙ্গি বা মিশ-নারীর প্ররোচনায় এই সকল গুণ্ডার দ্বারাই এই ঘোরতর অনর্থ ঘটিয়াছে। শশাঙ্ক ছুটিয়া যাইতেছে, দেখিয়া তাহারা তাহাকে পথিমধ্যেই আটক করিবার চেষ্টা করিল। আজ স্বয়ং রুদ্রদেব অসিয়াও বোধ হয় বীরযুবক শশাঙ্কের গতিরোধ করিতে পারে না। সে যে নারীর সম্মান, জাতির সম্মান রক্ষার জন্য বীরমদে মাতিয়াছে। শশাঙ্ক তাহার লাঠির প্রহারে দুইজনকে ভূতলশায়ী করিলে অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। শশাঙ্ক বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া অগ্রসর হইল। সম্মুখে একখানা অশ্বশকট দেখিতে পাইল, শকটের দ্বার রুদ্ধ, বাহিরে

দুই জন পাট গুদামের দ্বারোয়ান হাতিয়ার বন্দী হইয়া অতি নিষ্ঠুর তাড়নে অশ্ব চালাইতেছে। তাহাদের এক জনের হস্তে একটী বন্দুক। শশাঙ্ক বন্দুকধারীকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িল, সে অমোঘ লক্ষ্যে বন্দুকধারী মেড়ুয়া আহত হইয়া শকট হইতে গড়াইয়া ভূতলশায়ী হইল। ছুটিয়া গিয়া অপর ব্যক্তিকে লাঠির আঘাতে পাতিত করিল, এবং বজ্র পদাঘাতে শকটের দ্বার চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহারই মধ্যে গণেশের ভগিনী হারাণীকে হস্ত পদ মুখ বদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেল। শশাঙ্ক ক্ষিপ্র হস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ফুলী কোথায়? হারাণী বলিল ফুলমণিকে নদীর এপারে আনিয়া সাহেবের ঘরে আটক রাখিয়াছে। শশাঙ্ক বড় চিন্তা কাতর হইয়া পড়িল। ভয়ে মুহ্যমানা হারাণীকে কাহার কাছে রাখিয়া সে ফুলরাণীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে? হারাণী কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই সাহস পাইয়া বলিল, চিন্তা নাই, আমাকেও এক খানা লাঠি দিন, আমি আপনার সঙ্গেই যাব। তাহাই হইল, শশাঙ্ক সেই দারোয়ানের বন্দুকটা ছিনিয়া লইয়াছিল, তাহাই হাতে লইয়া লাঠিখানা হারাণীর হাতে দিল। হারাণী যুবতী কৃষককন্যা, দেহে তার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ও অটুট বল। সে লাঠি হাতে লইয়া শশাঙ্কের অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া একটা রুদ্ধদ্বার গৃহ দেখাইয়া দিল। শশাঙ্ক পদাঘাতে সে গৃহের দ্বার চূর্ণ করিয়া ফেলিল। গৃহ মধ্যে দেখিতে পাইল ফুলরাণী সংজ্ঞাহারা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, একটা ফিরিঙ্গি সেখানে বসিয়া রহিয়াছে। শশাঙ্ক ও হারাণীর তীব্র বীর মূর্ত্তি দেখিয়া ফিরিঙ্গি ত্রস্তে ছুটিয়া পলাইতেছিল। হারাণী তাহার পিঠে এক লাঠির আঘাত করিলে, নরপশু ফিরিঙ্গিটা পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে গণেশ মণ্ডল দশ পনর জন সহচর সঙ্গে আনিয়া মার মার শব্দে

সেখানে প্রবেশ করিল। হারাণী ব্যস্ত হইয়া ফুলীর শুশ্রূষার নিযুক্ত হইল। গণেশ ফিরিঙ্গিটার বক্ষে সজোরে একটা পদাঘাত করিয়া, পুনরায় আঘাত করিতে যাইতেছিল, শশাঙ্ক তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, চল, আমাদের কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, ভগিনীদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে, মা শক্তিশ্বরীর পায়ে প্রণাম করিয়া চল ইহাদিগকে লইয়া আমরা গৃহে ফিরি।

তাহাই হইল, কিন্তু আর যে সকল অল্প বুদ্ধি সহচর আসিয়াছিল, তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া সাহেব কোম্পানীর পাটের গুদামে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। সেই দাহ্যমান পাটের দীপ্ত আলোকে পথ দেখিয়া শশাঙ্ক ফুলরাণী ও হারাণীকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

সেই হইতে সেখানকার কোম্পানীর পাটের কারখানা উঠিয়া গেল। কিন্তু দেশের সামাজিক প্রধানেরা ঘোট করিয়া প্রচার করিলেন দেবেন্দ্র দেবের যুবতী কন্যা খ্রীষ্টানে কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাকে ঘরে ফিরিয়া আনায় দেবেন্দ্রের জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। ঐ কন্যা আর কোনও হিন্দু বিবাহ করিলেও তাহার জাতি যাইবে।

দেবেন্দ্রনাথ ও কমলা কথাটী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বামা বড় বড় সমাজপতিকে ডাকিয়া স্পষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, দেশের তোমরা প্রধান সমাজপতি, তোমরা ষড়যন্ত্র করিয়া, গুণ্ডা লাগাইয়া এই দুইটী বালিকার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছ। তোমরা নারী নিগ্রহ কারী মহাপাপী পতিত। তোমাদিগের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অন্যথা কোনও ভদ্রলোক, যে মায়ের সন্তান, ভগিনীর ভ্রাতা, সতীর পতি, সে তোমাদের সংস্রব করিবে না,

কেহ তোমাদের জলগ্রহণ করিবে না। আমি এই ব্যবস্থা দিতেছি, কে কে আমার ব্যবস্থা শুনিবেন আমি শুনিতে চাই।

বামাদেবীর আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য-দীপ্ত মুখমণ্ডলে কি একটা উজ্জল জ্যোতিঃ বিদ্যুৎপ্রভায় জ্বলিয়া উঠিল। কয়েকজন তরুণ যুবক সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আমরা আপনার ব্যবস্থা মানিয়া লইলাম।

বামাদেবী আবার বলিলেন, "দেখ প্রবীণ সমাজপতি সকল, তোমাদের ও অন্ধ লোকাচার মিথ্যাচার আর টিকিতে পারে না। নারীকে তোমরা মাটীর হাঁড়ির মত আস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা করিয়া তুলিয়াছ। তোমাদের শাস্ত্রের বিধি, শাস্ত্রের শাসন সকলই স্ত্রী জাতির উপর, তোমাদের মা বোনের উপর। তোমরা চাও, পুরুষ কদাচরী, লম্পট মাতাল হউক; নারীকে পুরুষের পায়ে বাঁধা থাকিয়া চলিতে হইবে। পুরুষের অঙ্গের বিষে নিরপরাধা নারী বিষে জর্জ্জরিত দেহ হইয়া অসহ্য বিষদাহ সহ্য করিয়া, মরিতে যাইয়াও বলিবে, পুরুষ তুমি দেবতা, তুমি আমার ইহ পরকালের উদ্ধার কর্ত্তা! এ আশা আর করিও না। মিথ্যা দম্ভ লইয়া তোমরা সমাজের শীর্ষে দাঁড়াইবে, তাহা আর চলিবে না।"

সেখানে রাধানাথ ভারতী উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাজের প্রধান ও প্রবীন ব্যক্তি। তিনি বামার কণ্ঠস্বর ও মুখজ্যোতিতে যেন কি এক দিব্য শক্তি অনুভব করিলেন। তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "বামা! তোমার ব্যবস্থাই সত্য। তুমি বল, যারা নারী নিগ্রহকারী, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

বামা স্পষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "এই আমার পূর্ব্বপুরুষ-সেবিত শালগ্রাম

শীলা নারায়ণ, এঁর সম্মুখে অকপট চিত্তে অপরাধ স্বীকার করিয়া সকলে বলুক, আর কখনও নারীর অপমানে অগ্রসর হইবে না। নারীর মান রক্ষায়, জীবন পণ করিবে।"

রাধানাথ বলিলেন, তাহাই ঠিক। আমরা তোমার শালগ্রাম ঠাকুরকে আজ ভক্তি ভাবেই প্রণাম করিতেছি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা ফিরিয়াছে। এবার মা বসুমতীর বুকে সোণা ফলিয়াছে। কৃষকপাড়া আবার হরির সংকীর্ত্তনে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কমলার আনন্দের সীমা নাই। আবার তাহার প্রজা বাড়ী হইতে মেয়েরা নূতন কাপড় পরিয়া মনিব বাড়ী ভেট দিতে আসিয়াছে। দেবেন বাবুর খামারে ধান হইয়াছে, এবৎসরের অন্ন চলিবে। তেজারতীর টাকা আদায় হইয়াছে।

নরেন্দ্র এবারও পরীক্ষার পর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ বাড়ী নাই বলিয়া ফুলীর বিবাহে বিলম্ব হইতেছে। দুদিন হইল নরেন্দ্র নাথ বাড়ীতে আসিয়াছে; আনন্দে কমলার বুক পরিপূর্ণ, তিনি পুত্রকে বলিলেন, "নরেন! তুমি গুরুদেবের সঙ্গে অনেক দেশ বেড়ালে; কোন্ কোন্ দেশ বেড়ালে, আমায় বলত?"

নরেন্দ্রনাথ বলিল, "আচ্ছা বলি মা শোন। গুরুদেবের সঙ্গে ঘুরে বহু দেশ, নদ নদী পর্ব্বত কানন দেখেছি। সেই প্রাচীন মিথিলা নগরী দেখেছি'—যেখানে রাজ কন্যা সীতা ধনুর্ভঙ্গ পণে বীর স্বামী বরণ করেছিলেন। সে স্থান দেখে মনে হয়েছিল মা, ভারত-রমণীগণ কি আবার এরূপ বীর পূজা করিতে শিখিবে? অযোধ্যা দেখিয়াছি, সেখানে ভগবান্ রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য শুদ্ধচারিণী সীতা দেবীকে বিসর্জ্জন করেছিলেন। রৈবতক পর্ব্বত দেখেছি; যেখানে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অতুল প্রতাপশালী রাজা দুর্য্যোধনের রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া তৎকর্ত্তৃক নিগৃহীত লাঞ্ছিত ধনঞ্জয়ের বীরত্ব গৌরবে আত্ম-

সমর্পণ করেছিলেন। আর সেই কুরুক্ষেত্র দেখেছি, যেখানে বীর জননী সুভদ্রা যোড়শ বর্ষের পুত্রকে স্বহস্তে বীর সাজে সাজাইয়া নির্ম্মম শত্রু সমরে পাঠাইয়াছিলেন। মা এ সব দেখ্‌লে মনে কি এক ভাবের উদয় হয়! যে ভারতে এমন ছিল, সে ভারতের আজ এ দুর্দ্দশা কেন হ'ল? গুরুদেব আমাকে অনেক তপোবন দেখাইয়াছেন। সেখানে আর্য্য ঋষিরা স্ত্রী পুত্র সংসার ভোগ বিলাস তুচ্ছ করিয়া বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞানের অনুশীলন কর্ত্তেন। তাঁহাদেরই জ্ঞান বিজ্ঞানে আজ ইউরোপ আমেরিকা ঐশ্বর্য্যশালী! কিন্তু ভারতের এ দুর্দ্দশা কেন? তার পর দেখিয়াছি রাজপুতনা পুণ্যভূমি, এখানে রাণী পদ্মিণী প্রভৃতি অসংখ্য রাজপুত রমণী জাতি ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য সহাস্যে চিতানলে ঝাঁপ দিয়াছেন। এই খানেই পত্তজননী মহাবীরা পুত্রবধূ সঙ্গে কৃপাণহস্তে শত্রু নিধন করিয়া যবনদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সেই দিল্লী,—কৌরবের রাজধানী হস্তিনাপুর দেখেছি; রাণী সংযুক্তা স্বামীর পতনের পর জন্মভূমি রক্ষার জন্য মহাশক্তিরূপে বিপুল যবন বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন! এ কথা মনে হইয়া দৃশদ্বতী নদীগর্ভে অশ্রুধারা ফেলিয়াছি। সেই পঞ্চনদ প্রদেশে গিয়াছিলাম, এই স্থানেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পবিত্র বেদগীতি লইয়া ভারতে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন! মা! তাঁহাদের পায়ে কোটি কোটি প্রণাম করেছি। মহারাষ্ট্র প্রদেশ দেখেছি। এই স্থানে মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজি বিপুল বলশালী মুসলমান বাদসাহকে উপেক্ষা করিয়া পবিত্র স্বরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মহারাষ্ট্র ধামে কত বীরপুরুষের কীর্ত্তি গাথা অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই সঙ্গে রাণী অহল্যাবাইয়ের পবিত্র স্মৃতিতে মনে এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হইল। উদ্দেশে তাঁহাদের পায়ে কোটি কোটি প্রণাম করিলাম।

শোন মা, আরও বলি। এই আর্য্য জাতি কি আবার সেই আশ্র জাতি হবে না? বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগর দেখে চক্ষুতে জল রাখিতে পারিলাম না। এই স্থানে ১৭ জন অশ্বারোহী যবন এসে হিন্দুর কর হ'তে সোণার বাঙ্গলা রাজ্য কেড়ে নিল। তারপর সেই মুর্শিদাবাদ, সেই পলাশীর ক্ষেত্র যেখানে গৃহচ্ছিদ্রের সাহায্য পাইয়া চতুর ক্লাইভ হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতিকে প্রতারিত করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। সে সময়ে এক জন ছিলেন রাণী ভবানী—তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুর্খ স্বার্থান্ধ হতভাগ্যগণ শুনিল না! স্বার্থ পঙ্কিল কুটিল পুরুষবুদ্ধির কাছে পবিত্র সরল নারীবুদ্ধি উড়িয়া গেল! নইলে ভারতে ফিরিঙ্গি জাতিকে কে চিনিত?

সেই হইতে ভারতের শিল্প বাণিজ্য জাতি ধর্ম্ম শাস্ত্র বিজ্ঞান সব গেল। মা! সেই ঢাকা বেনারস অমৃতসর এখনও দেখেছি, এখনও তা'দের কারুকার্য্যে জগৎকে মাথা নোয়াতে হয়। কিন্তু আর তাহার আদর নাই। আমরা আপাত সুন্দর অস্থায়ী বিদেশী চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়াছি; আমরা দেশের জিনিষের আর আদর করি না। কিন্তু মা সুখবর আছে। দিন ফিরিয়াছে; সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের লোকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আর বিদেশী জিনিষ ছুঁইবে না। শত শত বাঙ্গালী বিদেশীর গোলামী ত্যাগ করিতেছে। মা! এ কার্য্যে আমার বাবাই পথ প্রদর্শক! আমাদের কি আনন্দ!

পুত্রের বাক্যাবলীতে মাতার হৃদয় অতুল গৌরবে ফুটিয়া উঠিল। তিনি বড় সাগ্রহে বলিলেন, "যথার্থ ই কি বাঙ্গালী গোলামী ছাড়িবে?"

নরেন। হ্যাঁ মা! বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞা এবার অটল। গুরুদেব বলেছেন, বঙ্গবাসীর ইহাতে কল্যাণ হইবে। বাঙ্গালী মাতৃভূমির পূজার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে,—সে মন্ত্র কি জান মা,—"বন্দেমাতরম্"।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*ঃ০ঃ*—

বিলক্ষণ আনন্দোৎসাহে 'ফুলরাণীর' বিবাহ সম্পন্ন হইল। অনেক কাল পরে প্রজারা মনিব বাড়ী প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইল। ফুলের বয়স হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রতিবেশীরা কেহ কেহ স্ব স্ব কুটুম্বের কোন'ও কদাকার কদাচার ছেলের সহিত ফুলের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। পিতা মাতা ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহিতা রাখিয়াছেন, তবু তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। কাজেই আশে পাশে কাণাকাণি হইল,—কি বরই হ'ল যে! বাড়ীতে কুড়ে ঘর, মাথায় মোটে মুদীগিরি করে। চাষার মত খাটে। আরও গোঁয়ার! যেন গোরা পল্‌টন। মাঠে মাঠে বন্দুক নিয়ে ঘোরে। সে দিন কত বড় বাঘটাই মেরে ফেল্লে।"

বামাঠাকুরাণী জামাই মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "কেমন, এখন রাত দুপুরে শ্মশানে মসানে ছুট্‌বে কেমন ক'রে? গলা থেকে আঁচলের বাঁধ কি সহজে ছাড়াতে পার্‌বে?"

শশাঙ্ক হাসিয়া বলিলেন, "কেন, এত কাল গুরুমহাশয় তাঁর শিষ্যকে কি আঁচল ধরা কর্ত্তেই শিখিয়েছেন?"

বামা। অনেক পুরুষ আবার আঁচলে টানুক বা না টানুক, আঁচল ছাড়তেই চায় না।

শশাঙ্ক। তেমন কীটকে আঁচল ঝাড়িয়া সরাইয়া ফেলাই ভাল। সদ্‌গুরু এইরূপই উপদেশ দেন।

পাশে কমলা চুপে চুপে বলিলেন, "মা! জামাইয়ের কাছে হেরে গেলেন।"

বামা। আমি হার্‌লাম, মেয়ে জিত্‌বে।

এমন সময় সংবাদ আসিল ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিল। এ আনন্দের সময়ে গুরুদর্শন পাইয়া কমলার অন্তরে মঙ্গল ভাব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ব্রহ্মচারী আসিয়াই বলিলেন, "নরেনকে এখনই আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। দেশের কার্য্যের জন্য অন্ততঃ এক বৎসর নরেনকে আমার সঙ্গে ঘুরিতে হইবে।"

কমলা বলিলেন, "দুই একদিন বাদে গেলে হয় না?"

ব্রহ্মচারী। না মা! দুদিন কেন, অদ্যকার দিনও বিলম্ব করা যাবে না।"

মায়ের প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। আজ সবে সপ্তাহ মাত্র নরেন্দ্র বাড়ীতে আসিয়াছে, ফুলের বিবাহের জন্য এ কয়দিন তাহার সামান্য বিশ্রামটুকুও নাই। এমন সময়ে সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোথায় যাইবে? তাহাও এক বৎসরের জন্য! এমন আনন্দের সময়ে গুরুদেবের এ আদেশ বড় নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে ব্রহ্মচারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারী মায়ের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিলেন, কিন্তু বলিলেন, "মা। তুমি পুত্রবতী। পুত্রকে কেবল আপনার ধন করিয়া, বুকের মধ্যে স্নেহের আবরণে ঢেকে রাখা কি ভাল? সংসারে সহস্র পুত্র হীনা আছে; তোমার পুত্র যদি সেই সহস্র পুত্রহীনাকে মা বলিয়া ডাকে, সহস্র ব্যথিতের যন্ত্রণা, রোদিতের অশ্রু মুছাইয়া সহস্র বুকের মাতৃস্নেহ লাভ করিতে পারে, সেটা কি ভাল নয় মা! তোমার পুত্রের কার্য্যে যদি দেশের উপকার হয়, জন্মভূমির কল্যাণ হয়, তবেই জেন মা তুমি রত্নগর্ভা; নচেৎ পশু

পক্ষীতেও সন্তান প্রসব ক'রে থাকে। তোমরাই মা একদিন এমন ছিলে যে, দেশের কল্যাণে পুত্র ধনে বলি দিতে পারিতে!

কমলা লজ্জিত হইলেন। গুরুদেবের পায়ের উপর পড়িয়া কহিলেন, "গুরুদেব। আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি পুত্র কন্যার কে? আমি আজ হইতে পুত্র কন্যা আপনার পায়ে সমর্পণ কল্লাম।"

ব্রহ্মচারী কমলার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া সস্নেহ গদগদভাবে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নরেন্দ্র সুরেন্দ্র রাজ রাজেশ্বর হউক। কিন্তু মা, পুত্র কন্যা আমায় সমর্পণ করিলে কি হইবে? আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল যে, তুমি পুত্র কন্যা জন্মভূমির কল্যাণে উৎসর্গ করিলে।"

কমলা তাহাই করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*:•:*—

দেবেন্দ্রনাথের আর অভাব কষ্ট নাই;—দাসত্বের মনোমালিন্যও নাই। বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্রে তিনি কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। নিজের স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, দশ জন গরীবও তাঁহার খাইয়া বাঁচিতেছে।

দেশের চারিদিকে স্বদেশপ্রীতির তরঙ্গ উঠিয়াছে। আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষের কণ্ঠে মাতৃপূজার মহামন্ত্র "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিত হইতেছে। সবাই বলিতেছে, আর বিদেশীর লাথি খাইব না, বিদেশী বস্তু ছুঁইব না।

কমলার বড় আনন্দ। জামাতা শশাঙ্কের বীরোচিত হৃদয় ও আশ্চর্য্য শীকার কৌশল দেখিয়া একজন দেশীয় রাজা তাহাকে একটী উৎকৃষ্ট অশ্ব পুরস্কার দিয়াছেন। শশাঙ্কের ব্যবসায়ে এখন মাসে হাজার টাকা লাভ হইতেছে! ফুলের নাম "ফুল্লরাই" সার্থক হইয়াছে। শীকার যাত্রাভিলাষী বীরযুবক প্রফুল্লমুখে উন্নত শিরে, বীরসাজে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট, ফুল্লরা হাসিমুখে স্বামীর হাতে বন্দুক ও বর্ষা তুলিয়া দিতেছে! কমলা এ দৃশ্য একদিন দেখিয়াছেন! সে দিন তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রুর প্রস্রবণ ঝরিয়াছিল!

এ আনন্দের মধ্যে একটি চিন্তায় কমলাকে মাঝে মাঝে বড় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিত। নরেন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এক বৎসর হইতে যায়, এখনও ফিরে নাই। মাঝে মাঝে পত্র লেখে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, রাজদ্রোহী ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পশ্চাতে পুলিস নিযুক্ত করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কমলার বড় ভয় হয়।

যাহা হউক, ইহার মধ্যে একদিন জননীর স্নেহ ব্যাকুলিত হৃদয় উল্লাসচমকিত করিয়া নরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ বড় মলিন। নরেন্দ্রনাথ আসিয়াই বলিল, "গুরুদেব বড় দুর্ব্বল! তিনি বলিয়াছেন বেশী দিন আর বাঁচিবেন না; আপনাকে ও বামা ঠাকুরাণীকে তাঁহার কাছে লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন।" তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শিষ্য ও প্রিয়জনদিগের সঙ্গে তিনি শেষ সাক্ষাৎ করিবেন।

পরদিন প্রত্যুষেই সকলে যাত্রা করিলেন।

খরস্রোত, তরঙ্গকল্লোলময়ী পদ্মা নদীর তীরপ্রদেশে এক নিবিড় জঙ্গলে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থল করিয়াছেন। সকলেই সেস্থানে গিয়া ব্রহ্মচারীর পদ বন্দনা করিলেন। অশ্রুমাখা সস্নেহ নয়নে ব্রহ্মচারী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কায়মনোবাক্যে জন্মভূমির সুসন্তান হও।"

সকলের পথশ্রান্তি দূর ও আহারাদি সম্পন্ন করিতে দিবা অবসান হইল। নির্ম্মল চন্দ্রিকাদীপ্ত বনপ্রদেশে শিষ্যগণ বেষ্টিত যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সবাই আমায় ভালবাস; আমাকে বিদায় দিতে তোমাদের অন্তরে বড় আঘাত লাগিবে। কিন্তু আমার ভববাস-কাল পূর্ণ হইয়াছে, আর বিলম্ব করিবার অধিকার আমার নাই। তোমাদের কাছে আমার শেষ প্রার্থনা, পতিত জন্মভূমির দিকে তোমরা একটু চাহিও; প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া একবার আর্য্যভূমির উপর ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিও। আমি কাশী, ত্রিবেণী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন আদি তীর্থ ত্যাগ করিয়া এই স্থানেই দেহত্যাগ করিতে আসিয়াছি।

এই আমার জন্মস্থান। আরও বলি, বড় আনন্দ লইয়া আমি যাত্রা করিতেছি! আমি দেখিয়া চলিলাম, আবার আর্য্য-সন্তানগণ আপনাদিগকে চিনিয়াছে, আপনার মাকে চিনিয়াছে, স্বজাতি স্বধর্ম্ম চিনিরাছে। বড় আশা বুকে লইয়া চলিলাম, আবার আর্য্যভূমি ভারত-জননীর মুখ উজ্জ্বল হইবে।”

ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম লইয়া বামা ও কমলার দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, “মা! তোমাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, আর্য্য নারীগণ আবার বীরপূজা করিতে শিখিবে। আর্য্যভূমি সতী-ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র। আর্য্য রমণীগণ যথার্থই সতীলক্ষ্মী ছিলেন। কিন্তু বিকৃত শিক্ষার ফলে তাঁহারা সে গৌরব ভুলিয়াছেন। স্বামীকে ফুলের মূর্ত্তি ক্রীড়ার সামগ্রীর মতন সর্ব্বদা হাতে হাতে রাখিলে, বা তাঁহাকে সর্ব্বদা স্নেহরস-সিঞ্চনে সেবা যত্নে বশীভূত রাখিলেই সতীধর্ম্ম রক্ষা হয় না। যিনি সতী, তাঁহার কাছে পতি মহামহিমান্বিত দেবতা। সতীর কাছে পতি বীর, ধীর, স্বাধীন ও মহান্। যিনি সেই গৌরবময় স্বামীর বীরত্ব, মহত্ত্ব, স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তা করেন, স্বাধীনতা তেজে পতির মস্তক উন্নত হইলে যাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে তিনিই সতী, দেব-স্বামীর তিনিই দেবীসহধর্ম্মিণী। আর স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ সযত্নে ভাণ্ডারে তুলিয়া রাখা, বিলাস তৈজসে স্বামীর গৃহ সুসজ্জিত করা, বা দাস দাসীর প্রতি সর্ব্বদা সাবধান দৃষ্টি রাখিয়া গৃহ কার্য্যে শৃঙ্খলা সাধনই শুধু গৃহলক্ষ্মীর কার্য্য নয়। যাঁহার বিলাস-বিরাগ দেখিয়া স্বামী উপার্জ্জিত অর্থ মহত্তর কার্য্যে ব্যয়িত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি বিলাসকামনা উপেক্ষা করিয়া পবিত্র প্রীতিরসে স্বামিহৃদয়ে বিশ্বপ্রীতির ভাব জাগরূক করিবেন, তিনিই লক্ষ্মী? আশা করি এমন “সতীলক্ষ্মী” আবার আর্য্য দেশে আবির্ভূতা হইবেন। মায়ের জাতি, প্রীতির জাতি,

সৌন্দর্য্যের জাতি রমণীকূল যদি আপন ধর্ম্ম বুঝিয়া লন, তবে এ পতিত জাতি আবার জাগিবে! ভারতবাসী যখন বুঝিবে তাহাদের মাতা, বনিতা, ভগিনীগণ সামান্য লতাটীর ন্যায় দুর্ব্বল নয়, পতি পুত্রের অভাবে তাহারা গতিহীনা নয়, তাহারা স্বাধীন সবলা, শক্তির অংশ সম্ভূতা; তখন মাতা বনিতার ভবিষ্যৎ নিরুপায় নিঃসম্বল অবস্থা ভাবিয়া পুরুষেরা আর বিপদের ভয়ে কর্ম্মপথ হইতে সরিয়া আসিবে না। নারী যদি পুরুষের পায়ে লতাটীর মত জড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া না দেয়, বরং প্রীতির প্রদীপ ধরিয়া পতি পুত্রের কর্ম্মপথ আলোকিত করিয়া দেয়, তবেই পুরুষ বীর বিক্রমে অতি বিপদ সঙ্কুল কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবে।

ব্রহ্মচারী গণেশ, শশাঙ্কের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শশাঙ্ক! তোমায় আশীর্ব্বাদ করি তোমার বীর ব্রত সিদ্ধ হউক। আর গণেশ, তুমি দেশাচারে বংশ মর্য্যাদায় ছোট বলিয়া আপনাকে কখনও হীন বলিয়া মনে করিও না। আত্মার অপমান করা এক প্রকার আত্মহত্যা! মনে মনে রাজার প্রাণের মর্য্যাদা লইয়া কাঙ্গালের মত সকলের কাছে বিনয়ী হইবে। আর জীবনের ব্রত হইবে, যাহারা তোমার স্বজাতি ভাই বন্ধু তাহাদিগকে জ্ঞানের আলোক দিয়া মনুষ্যত্বের মহিমা বুঝাইয়া দিতে হইবে। হয়ত ইহাতে অনাদর বিদ্রূপ অনেক পাইবে, তবু কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তুমি অগ্রগামী, অগ্রগামীর অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

তিন দিন সকলে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে বাস করিলেন। ব্রহ্মচারীর আরও অনেক শিষ্যানুশিষ্য আশ্রমস্থলে সমাগত হইল। আশ্রমে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। কত রাজা মহারাজা ধনী মানী আসিলেন।

তৃতীয় দিবসে পূর্ণিমা রজনীর প্রথম প্রহরে দীপ্ত চন্দ্র মণ্ডলে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ব্রহ্মচারী দেহ ত্যাগ করিলেন। শিষ্যেরা চন্দন কাষ্ঠের চিতায় গুরুদেবের দেহ ভস্মীভূত করিয়া চিতা ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া লইলেন। তাহার পর পদ্মার জলে গুরুর তর্পণ করিয়া স্ব স্ব ধামে প্রস্থান করিলেন।

—০✽০—

সকলেই যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন নমঃশূদ্র কন্যা হারানী বলিল, আমি যাইব না। আমি গুরুদেবের এই আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার আশ্রমস্থলে প্রদীপ জ্বালিব। বামা বলিলেন তাহাই হউক, এখানে আমরা একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিব, যাহাতে পতিতা, লাঞ্ছিতা, ভাগ্যহীনা নারীরা আশ্রয় পাইবে। হারানী হইল এই আশ্রমের অভিভাবিকা।

সম্পূর্ণ।

"লক্ষ্মীমেয়ে", "লক্ষ্মীবউ", "লক্ষ্মীমা" সম্বন্ধে মতামত।

তোমার প্রণীত, **"লক্ষ্মীমেয়ে" "লক্ষ্মীবউ"** ও **"লক্ষ্মীমা"** পড়িলাম। ভাল লাগিল বলিয়া নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও আগ্রহপূর্ব্বক পড়িলাম। * * * এদেশে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী গ্রন্থে যে সকল উপাদান থাকা আবশ্যক, তোমার গ্রন্থে তাহার অনেকগুলি দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। তোমার লেখা সরল ও হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

* * * গ্রন্থগুলি জ্ঞানপ্রদ ও অতি সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত। * * *—**জষ্টিস্ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।**

আমি বিধুবাবুর পুস্তক কয়খানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন দেখিয়া গ্রন্থকার স্ত্রীলোকের পাঠকৌতুক পূরণচ্ছলে প্রকৃত শিক্ষার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহা আমার অনুমান। ইদানীন্তন কৃতী বাঙ্গালা গ্রন্থ লেখকগণের পুস্তকগুলিতে যাহার অভাব আমি এতাবৎকাল দেখিয়া আসিতেছি, গ্রন্থকার বিধুবাবু বোধ হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থত্রয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার তিন লক্ষ্মীর অন্যতমাও যদি কোন বঙ্গসংসারে উপস্থিত হন তবে অসার সংসার সসার হইবে। * * * গ্রন্থকারের দীর্ঘজীবনসহ তাঁহার গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনন্দগোপাল সরস্বতী,

হেড পণ্ডিত, টি, এন, জুবিলি কলেজ,—ভাগলপুর।

লক্ষ্মীমেয়ে, লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমা—তিনখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। * * * হিন্দুর মেয়ে এখন বিলাতী ধরণের শিক্ষায় অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে; তাহাদের সুশিক্ষার্থই এই উপন্যাসত্রয়ের সৃষ্টি। বিধুবাবুর লিপিনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। তাঁহার সরল গার্হস্থ্য উপন্যাস আড়ম্বর হীন, * * * কবি প্রতিভায় রসময়। এরূপ উপন্যাসের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গবাসী—১৭ই ভাদ্র ১৩০৬ সাল।

লক্ষ্মীমেয়ে—ইহাতে বঙ্গসংসারের শিক্ষার অনেক কথা আছে। নায়িকার নাম ইন্দুমতী। ইন্দুমতী যথার্থই লক্ষ্মীমেয়ে। ইন্দুমতীর চরিত্র অনুকরণে অনেক দুষ্ট মেয়ে লক্ষ্মীমেয়ে হইতে পারে!

বসুমতী—২৮শে আশ্বিন ১৩০৫।

লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমা—** * * * এই প্রকারের পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। মেয়েদের পড়িবার জন্য এ প্রকার সরল ও সুন্দর বহিরই দরকার। লেখকের লিপিকুশলতা আছে ও প্রাণে আগ্রহ আছে।

বসুমতী—২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ সাল।

লক্ষ্মীমেয়ে—ইহা একখানি অতি উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য গল্প-পুস্তক। সচ্চরিত্রতা ও সাধুতা ঈশ্বর কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হয়, গ্রন্থকার তাহা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

অমৃতবাজার—২১শে অক্টোবর ১৮৯৮ সাল।

লক্ষ্মীবউ—* * * * মোটের উপর পুস্তকখানি আমরা সুপাঠ্য বলিয়া অনুমোদন করি।

লক্ষ্মীমা—* * গ্রন্থকার এরূপ চরিত্র এরূপ সরলভাবে চিত্রিত করিয়া গৌরবভাজন হইয়াছেন। অমৃতবাজার—১০ই জুলাই ১৮৯৮।

লক্ষ্মীমা, লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমেয়ে—তিনখানি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক-গ্রন্থের ভাষা সরল ও রুচিমার্জ্জিত। দেশ কালের অতীত কোন অস্বাভাবিক চিত্র অঙ্কণে গ্রন্থকার প্রয়াস পান নাই। * * * বিধুবাবু মহিলাদিগের উপকারার্থেই এই গ্রন্থত্রয় প্রণয়ণ করিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি তাঁহার যত্ন সফল হইয়াছে। * * * গ্রন্থত্রয় স্ত্রীলোক-দিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

সঞ্জীবনী—২৯শে ভাদ্র ১৩০৬ সাল।

লক্ষ্মীমেয়ে—পুস্তকখানি কোন পারিবারিক গল্পে গঠিত। * * * গল্পের "প্লট" সরল হইলেও নায়িকার চরিত্রে পাঠকের মন প্রাণ মুগ্ধ হইবে। হিন্দু-বালিকার শিক্ষার জন্য এরূপ একখানি পুস্তক এক "ডজন" সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের তুল্য।

ইণ্ডিয়ান্ মিরার—২১শে জুলাই ১৮৯৮ সাল।

লক্ষ্মীবউ, লক্ষ্মীমা—* * * *ইহাদের ভাষা সরল ও কৃত্রিম-তার চিহ্ন মাত্র বিরহিত। ইহার "প্লট" সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কিন্তু পাঠকের মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়া হঠাৎই করুণার উদ্রেক করে। গ্রন্থকারকে সাহিত্য সমাজে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তিনি এই আড়ম্বর শূন্য, হৃদয়গ্রাহী পুস্তকপ্রণয়ণ করিয়া সাহিত্য-সমাজে প্রবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী—অন্ততঃ বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রকৃতনেতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হইবেন। যদিও মুরুব্বির অভাবে তাঁহার পুস্তকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইতে না পারে, তাহারা নিশ্চয়ই বঙ্গপরিবারের আন্তরিক আদর পাইবে এবং রমণীদিগের বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ও চরিত্র দৃঢ় করিতে ইহারা অতি শক্তিশালী উপাদান হইবে সন্দেহ নাই।

ইন্ডিয়ান্ মিরার—২১শে জুলাই ১৮৯৯।

লক্ষ্মীমেয়ে—* * গল্পটী বেশ সুপাঠ্য ও উপদেশপ্রদ।

বামাবোধিনী—১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ।

লক্ষ্মীমেয়ে—হিন্দু সংসারে হিন্দুরমনীর যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিতে পারে, ইহাতে তৎসমুদায় গল্পচ্ছলে নিহিত আছে। গ্রন্থের ভাষা সরল মিষ্ট ও নির্দ্দোষ। আমাদের গৃহিণীগণ নায়িকা ইন্দুমতীর অনুকরণ করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

লক্ষ্মীমা—* * * দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না, গ্রন্থকার যথার্থই একজন সহানুভূতি সম্পন্নলোক, তাঁহার চরিত্র-বর্ণন-শক্তি বিশেষ বলবতী, কিরূপ চরিত্র আদর্শ স্থান নয় তাহা তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষাটুকু বেশ সরল ও সুন্দর; * * * *।

বঙ্গভূমি—২৮শে চৈত্র ১৩০৬।

CHARU CHANDRA.

Opinions of the Press.

It is a story of every day life showing, how a young man living far away from the influence of home and family went astray and brought disgrace on himself and misery on his family, and how he was ultimately brought back from his path of error by the disinterested efforts of a noble woman. The name of the young man was Charu Chandra, and that of the woman Siddhi. She * * * * * supplies the element of romance in the story. The scene of the story is laid in Bengal in the first half of the last century. The characters of Siddhi, Charu Chandra's wife Prabhabati, and his old and faithfnll servant Ramkrishna are fairly well drawn. The book is written in fairly good Bengali.

Calcutta Gazette, April 3rd 1901.

Babu Bidhu Bhusan Basu has recently brought out a book named Charu Chandra. It is a novel which is full of moral lessons and happy expressions. The style in which it is written is easy and graceful. The plot is exceedingly interesting and the reader can hardly leave the book before he has finished it. The get-up of the book is fine.

Indian Nation, August 26th 1901.

চারুচন্দ্র—(উপন্যাস) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত। মূল্য ১।০ টাকা। এই বৃহৎ উপন্যাসখানি কেবল সুলভ নহে সুপাঠ্যও। লেখকের ইহা নবীন উদ্যম কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার ভাষা সুমার্জ্জিত, গল্প রচনার ভঙ্গী উত্তম এবং উপন্যাস খানি সুরুচিসঙ্গত। চারুচন্দ্র পাঠে গ্রন্থকারের উপন্যাস রচনার সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বসুমতী, ৪ঠা অক্টোবর ১৯০১ সাল।

চারুচন্দ্র—ইহা একখানি বৃহৎ উপন্যাস গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত। চারুচন্দ্র পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ তৃপ্তি লাভ করিবেন। ইহার ভাষা মার্জ্জিত, লিপি-কৌশল প্রশংসনীয়, ভাব পবিত্র ও কবিজনোচিত, উদ্দেশ্য মহৎ। এই উপন্যাসের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল। পাঠক-পাঠিকা তাহা হইতেই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা

২রা অক্টোবর ১৯০১ সাল